কৃষিকথা

নভেম্বর '৬৭

কৃষিকথা

২৯তম বর্ষঃ ১১শ সংখ্যা

নভেম্বর, ১৯৬৯ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

প্রধান সম্পাদক—
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

সহযোগিতায়—
হোসনে আরা রহমান
আবদুল হাই মাশরেকী
আবদুল মতীন জালালাবাদী

প্রচ্ছদ-শিল্পী
প্রাণেশ কুমার মন্ডল

সূচী

সয়াবিন ॥ আবদুল হালিম ॥ ৪৫৩

গাছের উন্নতির ক্রমবিকাশ ॥ মোল্লা শামসুদ্দীন আহমদ ॥ ৪৫৫

ভুলিস নে এ ধরার দান ॥ এ, এফ, এম, আমীর হোসেন খান ॥ ৪৫৯

গমের চাষ ॥ মহাম্মদ ফরহাদ উদ্দীন ॥ ৪৬০

ভাবের হাটে লেনাদেনা ॥ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ॥ ৪৬৪

পশু পরিচিতি (ঘোড়া) ॥ এম, এ, খান ॥ ৪৬৬

জমাট বাঁধা অশ্রু ॥ ফারুক আহমদ ॥ ৪৬৮

কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষিতথ্য কেন্দ্র ॥ ফজলুল হক ॥ ৪৭২

মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু ॥ জাওহার চৌধুরী ॥ ৪৭৪

আমার বাগানের মালটা ॥ মাহমুদ হোসেন ॥ ৪৭৬

কৃষকের স্বাস্থ্য ॥ এ, এম, এম, হাবিবুর রহমান ॥ ৪৭৮

ছোটদের কৃষি ঃ

পরিবর্তন ॥ সুলতানা নাজনীন আরা ॥ ৪৮০

তিন দেশের কৃষি ॥ আলফাল্লাহ ॥ ৪৮২

কৃষি জগতের টুকিটাকি ॥ আউয়াল আহমদ ॥ ৪৮৪

প্রশ্নোত্তর ॥ উত্তরদাতা—এম, আবদুল লতিফ ॥ ৪৮৭

পুস্তক পরিচয় ॥ দেওয়ান আবদুল হামিদ ॥ ৪৮৯

কৃষি-সংবাদ ॥ .. .. ॥ ৪৯০

আমাদের কথা ॥ .. .. ॥ ৪৯৭

কৃষিকথায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী বা লেখক কর্তৃক উপস্থাপিত মতামতই কৃষি বিভাগ দ্বারা স্বীকৃত—এমন নহে। তা'ছাড়া, কৃষিকথায় প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মতামত ই প্রতিষ্ঠানেরই মতামত।

কৃষিকথার গ্রাহক হউন

কৃষিকথার প্রকাশনা আপনারই জন্য এবং আপনার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কৃষিকথার বিষয়বস্তু নির্ধারিত করা হয়। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৮০ জনের একমাত্র মুখপত্র।

বছরের যে কোন মাসে এর গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি মাঘ মাস বা জানুয়ারী মাসে এর বছর শুরু হয়। এক বছরের কম গ্রাহক করা হয় না।

প্রতি সংখ্যার মূল্য পঁচিশ পয়সা মাত্র। বার্ষিক চাঁদা সডাক তিন টাকা। চাঁদা সব সময়ই অগ্রিম দেয়। পত্রিকা ভি, পি, পি, যোগে পাঠানো হয় না।

গ্রাহকবর্গকে তাহাদের যাবতীয় চিঠি-পত্রাদিতে গ্রাহক-নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

ডান পাশের একটি ফরম পরিষ্কারভাবে পূরন করে অতি সহজে কৃষিকথার গ্রাহক হউন।

বার্ষিক চাঁদা স্থানীয় কৃষি-কর্মচারীদের (ইউ-নিয়ন এগ্রিকালচারাল এসিস্টেন্ট বা থানা এগ্রিকালচারাল অফিসার বা সাব-ডিভিশনাল এগ্রিকালচার অফিসার) নিকট জমা দিন অথবা নিম্নের যে কোন একজনের কাছে মানিঅর্ডারযোগে পাঠিয়ে দিনঃ—

(১) চীফ টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ফরমেশন অফিসার,
কৃষিতথ্য কেন্দ্র,
৩, রামকৃষ্ণ মিশন রোড,
ঢাকা—৩

(২) আপনার ডিভিসনের—
ডিপুটি ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার।

টাকা জমা দেওয়ার রসিদের নম্বর ও তারিখ আপনার কাছে লিখে রেখে উক্ত রসিদটি এই ফরমের সঙ্গে নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিনঃ—

চীফ টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ফরমেশন অফিসার,
কৃষিতথ্য কেন্দ্র,
৩, রামকৃষ্ণ মিশন রোড,
ঢাকা—৩

ফরমটির শূন্যস্থান স্পষ্ট করে পূরণ করুন।

এখানে কাটুন

....

চীফ টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ফরমেশন অফিসার,
কৃষিতথ্য কেন্দ্র,
৩, রামকৃষ্ণ মিশন রোড,
ঢাকা—৩

জনাব,

আমি 'কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে চাই এবং আমাকে......................মাস থেকে এক বছরের জন্য গ্রাহক করুন।

*আমি..এর নিকট ৩্ টাকা জমা দিয়েছি অথবা মনিঅর্ডার করেছি।

*মানি অর্ডারের রসিদ নম্বর অথবা কৃষি কর্মচারীর নিকট জমা দেওয়ার রসিদ নম্বর............ তাং................। উক্ত রসিদটি এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

আমার নাম..

গ্রাম..

পোঃ..

মহকুমা..................জেলা..............

(বিঃ দ্রঃ—সঙ্গে রসিদ পাঠাতে ভুলবেন না)

সয়াবিন

আবদুল হালিম

সয়াবিন সীম জাতীয় ফসল। ইহার চাষে মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহার আবাদের জন্য দো-আঁশ মাটি উপযোগী। বেলে দো-আঁশ মাটিতে খরিপ মৌসুমে আর কাদা দো-আঁশ মাটিতে রবিখন্দে ভাল হয়; কিন্তু শুধু বেলে মাটি অথবা কাদা মাটিতে ভাল হয় না। আশ্বিন-কার্তিক মাসে বৃষ্টিপাত কম হইলে রবিখন্দের ফসলে সেচের আর খরিপখন্দের চাষে অতি বৃষ্টির সময় পানি নিকাশের প্রয়োজন হয়। বুনিবার সময় রবিখন্দে আশ্বিন-কার্তিক আর খরিপখন্দে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। তোলার সময় রবিখন্দে মাঘ-ফাল্গুন আর খরিপখন্দে ভাদ্র-আশ্বিন। উভয় খন্দেই সময় লাগে ১৫০ হইতে ১৬০ দিন। সুতরাং এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, রবিখন্দে চাষ করিলে ইহা পরবর্তী আউস ধান বোনার সময় পিছাইয়া দেয় আর খরিপখন্দের চাষে, ইহা আমন ধানের জমি দখল করিয়া রাখে। উভয় কারণে পূর্ব পাকিস্তানে সয়াবিনের আবাদ সম্প্রসারণের খুব বেশী সম্ভাবনা নাই। তদুপরি ইহার তৈল নিষ্কাশন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় করিতে হয় বলিয়া এদেশের চাষী ইহার আবাদের বেশী উৎসাহ প্রকাশ করে না।

ইহার আদি স্থান চীন দেশ। পাঁচ হাজার বৎসর আগেও নাকি সে দেশে ইহার আবাদ ছিল। আমাদের প্রতিবেশী ভারতে হিমালয়ের নিকটবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলে অনেককাল যাবৎ ইহার চাষ হইতেছে।

সয়াবিনের গাছ বাড়িবার জন্য মাটিতে এক প্রকার জীবাণু (Bactaria) বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। যে দেশে গোবর অথবা আবর্জনা সার ব্যবহার না করিয়া বৎসরের পর বৎসর শুধু কৃত্রিম সারের সাহায্যে ইহার চাষ করে সে দেশে উক্ত জীবাণুর অভাব হয়; ফলে সেখানে সয়াবিন জন্মে না। এমতাবস্থায় যে জমিতে পূর্ব বৎসর ইহার চাষ হইয়াছে, সে জমি হইতে কিছু মাটি নিয়া অন্য জমিতে রোপণের আগে বীজের সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে ইহার প্রয়োজন হয় না। বীজের গায়ে সব সময়ই যে অল্প সংখ্যক জীবাণু লাগিয়া থাকে, আমাদের জমিতে গাছকে সতেজ ও পুষ্ট রাখিতে তাহাই যথেষ্ট।

সয়াবিন সীম জাতীয় ফসল বলিয়া ইহা এক প্রকার জীবাণুর সাহায্যে বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন ধরিয়া শিকড়ের মধ্যে জমা করে, ফলে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ইহার চাষে গোবর, আবর্জনা প্রভৃতি নাইট্রোজেন প্রধান সারের বেশী প্রয়োজন নাই। জমি তৈরীর সময় একরে তিন মণ হিসাবে হাড়ের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া মাটিকে উত্তমরূপে পাইট করিয়া নিতে হইবে। তৎপর দেড় ফুট হইতে দুই ফুট অন্তর লাইন করিয়া নয় ইঞ্চি হইতে বার ইঞ্চি দূরে দূরে, দেড় ইঞ্চি নীচে বীজ পুতিয়া দিতে হইবে। একরে বীজের পরিমাণ সাত আট সের।

বুনিবার পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে বীজ গজাইবে এবং দেড় মাসের মধ্যে ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিবে। তিন-চার মাসের মধ্যেই সীম পাকিতে শুরু করে। সব ফল পাকার পর গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়ে। শিকড়ে নাইট্রোজেন জমা হয় বলিয়া গাছ টানিয়া না তুলিয়া মাটির উপরে কাটিয়া আনা ভাল।

ফলন—একর প্রতি ফলন আট নয় মণ, ভাল হইলে পনর মণ পর্যন্ত হইতে পারে। গাছের শুকনা ভুষি হইবে ১৫ থেকে বিশ মণ। ইহা গরু-ছাগলের জন্য খুব পুষ্টিকর খাদ্য।

ব্যবহার—সয়াবিন একাধারে প্রোটিন ও তৈল প্রধান অতি পুষ্টিকর খাদ্য এবং সহজ পাচ্য। ইহার আটায় শতকরা প্রায় পঞ্চাশ (৫০) ভাগ প্রোটিন এবং বিশ (২০) ভাগ তৈল আছে। সুতরাং মাংস এবং দুধ বা মাখনের অভাব একা সয়াবিনই পূরণ করিতে পারে। তদুপরি কমবেশী প্রায় সমস্ত ভিটামিনই সয়াবিনে বিদ্যমান আছে। সুতরাং সয়াবিন খাদ্য মাংস ও দুধের চেয়ে অধিক পুষ্টিকর এবং মূল্যের দিক দিয়া অনেক সস্তা।

সয়াবিনের আটাকে গমের সহিত মিশাইয়া চাপাতি, রুটি, বিস্কুট, পরোটা, সেমাই, সিঙ্গারা, পুড়ি, গজা প্রভৃতি এবং ডালের সহিত মিশাইয়া, ডাল, বড়া, স্যুপ, পাঁপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে খাদ্য অধিকতর পুষ্টিকর হয়।

সয়াবিনের আটা মিলে করা যাইতে পারে অথবা ভাজিয়া খোসা ছাড়াইয়া যাঁতায় পিষিয়াও আটা করা যায়।

সয়াবিন স্বভাবতঃ কিছুটা তিতা। ইহাকে সারা-রাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া মধ্যে দুই তিন বার পানি পরিবর্তন করিয়া দিলে উক্ত তিক্ততা দূর হয়। পরে যাঁতায় পিষিয়া পরিমাণ মত পানি মিশাইয়া মিহি কাপড়ে ছাকিয়া নিলেই সয়াবিনের দুধ প্রস্তুত হইবে। উক্ত দুধ হইতে দৈ আর ছানা কাটিয়া সন্দেশ ও পায়েস করা যাইবে।

আমাদের দেশে দুধ বা ছানা জাতীয় খাদ্যের অভাব খুব বেশী, সুতরাং সয়াবিন জাত খাদ্যের প্রয়োজনও আমাদের দেশেই সব চেয়ে বেশী। ইহার ভাজা ডাল নানা প্রকার তরকারী, খিচুরী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

সয়াবিনের আটা হইতে চীনদেশে শতাধিক প্রকার নানা পুষ্টিকর ও রুচিকর খাদ্য প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে দুধ ও তৈল হিসাবে ইহার ব্যবহারই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহা খুব পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া যে দেশে সয়াবিন হইতে প্রস্তুত খাদ্যের প্রচলন যত বেশী, সে দেশের লোক ততবেশী স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী, কর্মপটু ও উন্নত।

সয়াবিনে চিনির পরিমাণ খুব কম বলিয়া, বহুমূত্র রোগীর জন্য সয়াবিন জাত খাদ্য আদর্শ বলকারক পথ্য। অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য ব্লাড প্রেসার রোগীর পক্ষে অনিষ্টকর। সায়াবিনকে পানিতে পিষিয়া তৈল বাহির করিয়া নিয়া যে আটা পাওয়া যায়, তদ্বারা প্রস্তুত খাদ্য ব্লাড প্রেসারের রোগীর পক্ষে খুব ভাল পথ্য।

বর্তমানে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সয়াবিন হইতে নানা প্রকার সাবান, রং, মোমবাতি, কৃত্রিম রবার, বার্নিস প্লাস্টিক্‌স্ প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য এবং বহু প্রকার শক্তিশালী বিস্ফোরক পদাথ প্রস্তুত হইতেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্যে ব্যবহৃত তৈলের মধ্যে সরিষার তৈলই প্রধান। কিন্তু কবিরাজী ও হেকিমী মতে সরিষার তৈল খুব প্রদাহ জনক, সুতরাং তদ্রূপ অনিষ্টকারী। ইহার নিজস্ব কোন খাদ্য মূল্য নাই। কিন্তু অনিষ্ট করার ক্ষমতা খুব বেশী। খাদ্য প্রস্তুতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও সরিষার তৈল ব্যবহৃত হয় না। এখানে স্বভাবত প্রশ্ন উঠিতে পারে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ সরিষার তৈল ব্যবহার করিলেও তাহাদের মধ্যে ইহার অনিষ্টকারিতা পরিলক্ষিত হইত না কেন? তার কারণ মাছ-মাংস তরিতরকারী, দুধ, দৈ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে তখন পাওয়া যাইত বলিয়া সরিষার তৈলের অনিষ্টকারিতা ততটা মারাত্মক হইত না। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে খাওয়ার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিলে সরিষার তৈলের কুফল স্বরূপ আমাশয়, অম্লপিত্ত অম্লশূল প্রভৃতি আন্ত্রিক প্রদাহ (gastric ulsar) দেখা দেয়। অথচ সয়াবিনের তৈল ব্যবহার করিলে উপরোক্ত কুফল কখনও দেখা যাইবে না। ডাল, মাছ, গোসত, তরিতরকারী প্রভৃতি পাক করিতে এবং পরোটা, লুচি ভাজতে সয়াবিন তৈল ব্যবহার করিলে পরিবারে বিশেষতঃ শিশুদের মধ্যে অজীর্ণ রোগ হইতে পারিবে না। জাতীয় মঙ্গলের জন্য উপরোক্ত তথ্যাবলির বহুল প্রচার আবশ্যক।

—::—

গাছের উন্নতির ক্রমবিকাশ

মোল্লা শামসুদ্দীন আহমদ

ভূমিকাঃ—আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর ...গে অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের জন্মেরও বহু আগে মরুবাসী ...রব বেদূইনগণ বছরের একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে আনন্দ-...সরা করে পুরুষ খেজুর গাছ থেকে ফুলের ডাঁটা ...রে তো স্ত্রী খেজুর গাছের ফুলের উপর ঝেড়ে দিতেন। ...তে পুরুষ ফুলের ডাঁটা থেকে পুং রেণু স্ত্রী ফুলের গর্ভ ...শয়ের পতিত হত। বেদূইনগণ এই উৎসবকে বলত ...জুর বিয়ের উৎসব। শতাব্দীর অভিজ্ঞতা থেকে তারা ...নতে পেরেছিল যে এ হেন পন্থায় বিয়ে দিলে যে ...জুর হয় তা হয় অনেক উন্নতমানের।

কৃষি বিজ্ঞানীগণের মতে মরু বেদূইনদের সে ...সবের পেছনে হয়ত কোন প্রকার উৎকৃষ্টতর বিজ্ঞান ...ল॥ বলা বাহুল্য, পৃথিবীর সেরা খেজুর উৎপাদন-...কারী দেশগুলির মধ্যে আজও আরব দেশগুলি শীর্ষ ...নীয়।

তারও বহু বছর আগের কথা বলছি। তখন ...নুষ কাপড়-চোপড় তো দূরের কথা, ঘর বাড়ীও ...তৈরী করতে শিখেনি। তারা তখন পাহাড়-পর্বতের ...গুহায় বাস করত ও গাছের ফল-মূল ও বন্য জীব-...জন্তুর মাংস খেয়ে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের মতই ...য় জীবন যাপন করত। তখন তারা গাছ থেকে ...ল পেড়ে খেলেও এ কথাটা জানতো না যে, কিসের ...থেকে বা কেমন করে নতুন গাছ জন্ম নেয়। এরই মধ্যে একদিন তারা হঠাৎ করে আবিষ্কার করল যে, ফলের ভিতরকার ছোট এবং শক্ত অংশটি যাকে তারা এতদিন অখাদ্য বলে অবজ্ঞাভরে ফেলে দিত সেটি থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন একটি গাছ। সেদিনকার গুহা মানব বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যের এই মহান আবিষ্কারে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। এই আবিষ্কার থেকে জন্ম নিল কৃষি বিজ্ঞানের। মানুষ আয়ত্ব করল গাছপালা জন্মানোর কলা-কৌশল। ফলে তারা জন্মাতে লাগল শুধু ঐ সমস্ত গাছপালা যেগুলির ফলমূল খেতে তাদের অধিকতর ভাল লেগেছে। এই ভাবে গাছের বীজ রোপণের দিন থেকে প্রকৃত পক্ষে রোপিত হল মানব জাতীর সভ্যতার বীজ।

ঐ কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার পথ ধরে আমরা লাখো লাখো বছর এগিয়ে এসেছি। আমরা এখন সভ্যতার প্রায় চরম শিখরে উপনীত হয়েছি। পৃথিবীর মানুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে অন্য গ্রহে পাড়ি দিচ্ছে। সেখান থেকে আবার খেয়াল খুসীমত পৃথিবীতে ফিরে আসছে, চাঁদে যাচ্ছে বা নিজের যানটিকে নিয়ে নিজেই একটি ক্ষুদে চাঁদ হয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

কিন্তু এত করেও মানুষ খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত সেই অসভ্য গুহামানবদের মতই গাছ পালার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

খাদ্য হিসাবে মানুষ ভাত, রুটি, শাক-সব্জি, ফল-মূল ছাড়াও দুধ, মধু, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি লাখো রকমের জিনিষ গ্রহণ করে থাকে। লজ্জা নিবারণ ও সৌন্দর্যের জন্য পরিধান করে সূতি, রেশমী, পশমী ও নাইলন বস্ত্র। এক কথায় এক পানি ব্যতীত মানুষ আর যা কিছুই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, যে বস্ত্রই পরিধান করে তাদের সব কটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ জগতেরই দান। জন্মের পর থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ শিশুর দোলনা থেকে মৃতদেহের কাফন ও কফিন পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ গাছপালার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। মানুষের ঘরবাড়ী, চৌকি, লেপ, তোষক, বালিশ, মশারী, শিল্পের কাঁচামাল, অফিসের চেয়ার, টেবিল, কাগজ, কলম, খাতাপত্র, শিক্ষার্থীর বই, শিল্পীর তুলি ও কেনভাস; পথশ্রান্ত পথিকের ছায়া ও বিশ্রামস্থল, মাঝির নৌকা, কৃষকের লাঙ্গল, জোয়াল, মই, কৃষাণীর ঢেঁকি ও রান্নার খড়ি, বৃদ্ধের লাঠি, পরিশেষে গোটা দেশের সম্পদ কয়লা ও পেট্রোল, এমন কি প্রিয়ার আংটিতে বসানো হীরা এ সমস্তই উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তু প্রতি নিশ্বাসে যে অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করে তাও রাতের আঁধারে মানুষের অলক্ষ্যে বিশুদ্ধ করে দেয় গাছপালা। বায়ুমণ্ডল থেকে পানিকে আকর্ষণ করে পৃথিবীতে বৃষ্টি নামায় এই গাছপালা। এক কথায় গাছ পালাই এই পৃথিবীকে জীবিত রেখেছে নচেৎ এই পৃথিবীও চন্দ্রের ন্যায় বহুদিন পূর্বেই মারা যেত, তাই যে দেশ ও জাতি এই উদ্ভিদ জগতের যত বেশী উন্নতি করতে পেরেছে আজকের দিনে সেই দেশ ও জাতিই তত বেশী উন্নত বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

মানুষ প্রকৃতির বহু রহস্যের উদঘাটন করতে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু গুহামানবদের আবিষ্কৃত বীজের রহস্য উদঘাটনে এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বীজ বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যের একটি ক্ষুদে রাজ্য।

মানুষ মানুষের প্রতিচ্ছবিকে বিদ্যুতে পরিণত করে সেই বিদ্যুৎকে শক্তির কাজে লাগাচ্ছে অথবা সেই বিদ্যুত থেকে আবার প্রতিচ্ছবি বের করে এক স্থানের লোক বা বস্তুবিশেষকে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্য স্থানে দেখাচ্ছে। বলা বাহুল্য এ সমস্তই উৎকৃষ্টতর বিজ্ঞান, কিন্তু প্রাণিতত্ত্বের বিজ্ঞান আরও জটিল এবং মহামূল্যবান। বীজ জড় বস্তু অথচ অনুকূল পরিবেশে এর মধ্যে আসে নতুন প্রাণের স্পন্দন, এর মধ্যে নিহিত আছে ভবিষ্যতের মহা ইঙ্গিত এবং মানব জাতির জন্য মহা কল্যাণ।

বিজ্ঞানে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বলেছেন, "সর্ব্ব প্রথম চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহে পৌঁছার মধ্যে বাহবা থাকতে পারে কিন্তু প্রকৃত পূণ্য ও মনুষ্যত্বের অধিকারী সেই মহা মনীষি যিনি বীজকে উন্নত করে মানব জাতীর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথে দেশকে একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।"

ম্যানডেল নামক জনৈক খৃষ্টান ধর্মযাজক বিংশ শতাব্দির তৃতীয় বর্ষে বীজের অভ্যন্তরে অবস্থিত সৃষ্টি বৈচিত্রের প্রথম সূত্র আবিষ্কার করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ইহার পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণ তাদের নিজ নিজ দেশের ফসলের উন্নতি কল্পে অসভ্য গুহা মানবগণ কর্তৃক প্রচলিত নির্ব্বাচন পন্থাই অবলম্বন করে গেছেন। লাখো লাখো বছরের নির্ব্বাচনের ফল স্বরূপ আমরা লাভ করেছি আজকের দিনের ভাল ভাল গাছপালা, ফল-মূল, শাক-সব্জি, লতা-গুল্ম ও রং বেরং-এর ফুলে সুশোভিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ। বলা বাহুল্য পূর্বে হাজারো জংলী গাছপালা ও লতা-পাতার মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতের গাছের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। মানুষ খারাপগুলিকে জেহাদের মনোবৃত্তি নিয়ে অবলীলাক্রমে ধ্বংস করেছে, সাথে সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি ও আদর-যত্ন দিয়ে বাড়িয়েছে ভাল-গুলিকে। আবার দেশ বিদেশ থেকে ভাল ভাল গাছপালা আমদানী করে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করেছে নিজেদের দেশকে।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, মালবেরী গাছের বীজ চীন দেশীয় কোন রাজকন্যা ভারতে এনেছিলেন তার চুলের কবরী খানাতে লুকিয়ে। অনুরূপভাবে ভারতীয় সুন্দরীগণের মাধ্যমে সেই মালবেরী বীজ জাপান অবধি বিস্তারলাভ করেছিল।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে আমেরিকার নতুন ইউরোপীয় সরকার, সরকারী প্রচেষ্টায় বিপুল অর্থ ব্যয়ে ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে হাজার হাজার গাছপালা, ফল-মূল, শাক-সব্জি আমদানী করেন। সে উদ্দেশ্যে সরকার বড় বড় উদ্ভিদ বিজ্ঞানীকে জাহাজ যোগে দেশ-বিদেশে পাঠিয়ে দিতেন।

আমাদের পাক-ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীন। দ্রাবিড়, আর্য, অনার্য, শক, হুন, পাঠান, মোগল, ইংরেজ শতাব্দীর পর শতাব্দী এ দেশকে শাসন করেছেন, শোষণ করেছেন, আবার সাথে সাথে গাছ পালা আমদানী করে সমৃদ্ধও করে গেছেন।

আমাদের চির সবুজ সোনার পূর্ব পাকিস্তানও এক কালে এমনটি ছিল না। একে সমৃদ্ধ করা হয়েছে দেশ বিদেশ থেকে গাছপালা, ফল-মূল, মসল্লা, শাক-সব্জি, লতা-গুল্ম ও বিভিন্ন ফুল ও ফসলের আমদানী করে।

বিগত কয়েক শতাব্দীতে যে সমস্ত গাছপালা এ দেশে আমদানী করা হয়েছে তার একটি তালিকা পাওয়া যায় জনাব কলিমউদ্দিন আহমদ কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় লিখিত "পূর্ব্ব পাকিস্তানের কৃষি" (Agriculture in East Pakistan) নামক পুস্তকে। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে তিন চার শ' বছর আগেও এ দেশে রান্নার প্রাথমিক উপাদান মরিচ, আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, জিরা ইত্যাদি ছিল না। ছিল না একমাত্র তৈল ফসল সরিষার আবাদ। ছিল না অর্থকরী ফসল গোল আলু, গম, ইক্ষু, তামাক, চিনাবাদাম, চা, মসুর ইত্যাদি। ফলের মধ্যে ছিল না আনারস, পেয়ারা, লিচু, নারিকেল, সফেদা, তেতুঁল ও ভাল ভাল জাতের আম। শাক-সব্জির মধ্যে ছিল না ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালং, মূলা, বিলাতী বেগুন, বরবটি, শালগম, গাজর, ক্ষিরা ইত্যাদি। ফুলের মধ্যে ছিল না গোলাপ, কবরী, ওলকম্বল, চাঁপা, অপরাজিতা, বাবুই, রক্ত কবরী, ডালিয়া, কস্‌মস্ আরও অনেক কিছু। তৎকালীন রোগ নিরাময়ের একমাত্র ঔষধ আমলকি, হরিতকি, বহেড়া ও তুলসী—এ সবের আবাদও এ দেশে ছিল না। এ সমস্তই বিগত কয়েক শতাব্দীতে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে এবং এরই ফলে এ দেশ ভরে উঠেছে ধন-ধান্যে ও পুষ্পে।

ধান যদিও এ দেশের আদি ফসল তবু বর্ত্তমানে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং ব্যাপক আবাদকৃত নাইজারশাইল ও লতিশাইল ধান দুটিই কিছুদিন পূর্বে বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছিল। অতি সাম্প্রতিককালে ফিলিপাইনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে আনীত প্রায় দেড় হাজার ধানের মধ্যে ইরি-৮ ও ইরি-৫ এ দুটি ধান এ দেশে যাদুকরী বা আজব ধান নামে খ্যাতি লাভ করেছে। পর্যাপ্ত পানি সেচের ব্যবস্থা ও অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে পারলে এই ধান দুটির যাদুকরী ফলনের সাহায্যে এ দেশকে খাদ্যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই নয় বরং উদ্বৃত্তে পরিণত করা যেতে পারে।

হল্যাণ্ড জাতীয় আলুর চাষ বর্ত্তমানে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল।

আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগেও রাজবাড়ী, নাটোর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া প্রভৃতি মহকুমায় বন্যায় ধান ফসল নষ্ট হয়ে গেলে বিকল্প কোন ফসলের আবাদ হত না, ফলে চাষীদের কষ্ট চরমে পেঁছিত। বর্ত্তমানে সেখানে প্রচুর গমের আবাদ হয়ে থাকে।

জাপানী তরমুজ এদেশে প্রথম আসে ইংরেজী ১৯৬৩ সালে। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে পাবনা, রাজশাহী ও কুমিল্লা জিলায় এর আবাদ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অন্যান্য জেলায়ও জাপানী তরমুজের আবাদ দ্রুত বেড়ে চলেছে। পাট এ দেশের চাষীদের একমাত্র অর্থকরী ফসল। পাটের চাষ বাদ দিলে

এ দেশের আর্থিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে যাবে। অথচ বর্ত্তমানে এ দেশে যে সমস্ত জাতের পাটের আবাদ হয় সে সব আনা হয়েছিল হিন্দুস্থানের বিহার প্রদেশ থেকে।

বলা বাহুল্য, এখন পর্যন্ত প্রতি বছর সরকারী. বেসরকারী এই উভয়বিধ পন্থায় হাজার হাজার গাছ পালা, শাক-সব্জি ও ফসলাদি বিভিন্ন দেশে আদান প্রদান হচ্ছে। গত পাঁচ সাত বছরে যে সমস্ত গাছ পূর্ব পাকিস্তানে নতুন আমদানী করা হয়েছে তার মধ্যে আঙ্গুর, পিকান বাদাম, এভোকেডো বাদাম, পিচ, কফি ও গোল মরিচ অন্যতম। হয়ত আগামী শতকে এ সমস্ত আমাদের দেশের নিজস্ব সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে।

এত করেও সৃজনশীল ও অতৃপ্তমনের অধিকারী মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। সে চায়, আরও নতুন কিছু। কেমন করে নিত্য নতুন গাছপালা আবিষ্কারের রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় এটাই হয়ে দাঁড়ালো মানুষের প্রধান প্রশ্ন। সৃষ্টি বৈচিত্রের এই রহস্য উদ্ঘাটনের প্রথম সূত্র দিয়ে গেলেন মহামতি ম্যানডেল। তিনি তার জ্ঞান চক্ষু দিয়ে দেখ্‌তে পেলেন বীজের অভ্যন্তরভাগের গভীরতম প্রদেশকে, একই বীজের ভিতর দেখ্‌তে পেলেন নানাবিধ নতুন গাছ আবিষ্কারের সূত্র। মহামতি ম্যানডেল এই সূত্রগুলির নাম দিলেন "জিন" (Gene)। এই জিন থেকে জন্ম নিল "জেনেটিক্স" নামক বিজ্ঞানের। জেনেটিক্সের সাহায্যে এমন সব নতুন নতুন গাছের আবিষ্কার হতে আরম্ভ হল যে সমস্ত গাছ পৃথিবীতে এর পূর্বে হয়ত কোন কালেই বিদ্যমান ছিল না। এমনি করে উদ্ভিদ জগতে সূচিত হল আর এক নতুন অধ্যায়।

মানুষ তাদের নিজেদের পছন্দমত গুণাগুণ সম্পন্ন গাছপালা পাবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনের সঙ্গে যোগ করে দিল আবিষ্কারের অধ্যায়, ফলে বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে গাছপালা ও ফসলাদির দ্রুত উন্নতি সাধিত হতে আরম্ভ হল।

এদিকে প্রকৃতিতে ফসলের যে অবনতি ঘটে তার কারণও খুঁজে পাওয়া গেল। জানা গেল, ফসলের উন্নতির ন্যায় অবনতির কারণও বীজের ভিতরে অবস্থিত জিনেরই খেলা। একই গাছের বীজ থেকে অনেকগুলি গাছ জন্মিয়ে দেখা গেছে যে, সে সমস্ত গাছের আকৃতি ও তাদের ফলের গুণাগুণে অনেক পার্থক্য। অর্থাৎ একই বীজে বহু জিন বিদ্যমান ও তাদের গুণাগুণও পৃথক। তাই প্রয়োজন দেখা দিল ভাল ভাল জিনকে বিজ্ঞানীদের আয়ত্বাধীনে রাখার বা বিভিন্ন উন্নত জাতের ফসলের আবিষ্কার করে তার গুণ বৈশিষ্ট বজায় রাখা। উন্নত দেশসমূহে সে উদ্দেশ্যে নানাবিধ বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। বীজের জাত ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য সে সমস্ত দেশে বহুবিধ আইনও প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

—:০:—

ভুলিস নে এ ধরার দান

এ.এফ.এম আমীর হোসেন খান

ও ভাই চাষীরে, ভুলিস্‌না এই ধরণীর দান।
থা ·ওই চন্দ্রে অভিযান ॥

সুজলা সুফলা ধরা,
দেয় আমাদের খাওয়া-পড়া,
আছে ভরা বিশ্বপতির দান।

চাঁদের ওই ঝল্‌মলানি,
থাই করল হয়রাণী,
ওখানেতে হয়না ইরি ধান ॥

টাকার পাহাড় করে নষ্ট,
করল যারা বহুৎ কষ্ট,
বুঝল পষ্ট, ধরাই মহান।

চাদে নাই মোটেই হাওয়া,
কিছুই গেলনা পাওয়া,
যায়না খাওয়া চাঁদের কণা খান ॥

ওরে আমার মাটির মানুষ,
লাভ নাহি উড়ায়ে ফানুষ,
নাই কিছু আর এই মাটির সমান।

যতই ছুটিস্‌ গ্রহে গ্রহে,
এই মাটিরই অনুগ্রহে,
শেষে তোর বাঁচিবে পরাণ ॥

—:০:—

গমের চাষ

মহাম্মদ ফরহাদ উদ্দীন

খাদ্যমানের দিক থেকে চালের চেয়ে গমের মূল্য বেশী। যে সব স্থানে সেচের পানির পরিমাণ কম আছে অথবা মাটিতে বালির ভাগ কিছুটা বেশী আছে, সে সব স্থানে বোরো বা ইরিধান চাষ না করে গম চাষ করা উচিৎ।

কোন্ গমের চাষ করবেন ?

*১। এদেশে দেশী গমের গড় পরতা একর প্রতি ফলন মাত্র ৭।৮ মণ পাওয়া গিয়াছে। অন্য দিকে মেকসিকান জাতের গমের ফলন অনেক স্থানেই ৪০।৫০ মণ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

*২। মেক্সিকান জাতের গমের মধ্যে দু'টি অধিক ফলনযুক্ত গম এদেশে এখন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ দু'টি জাত হ'ল সোনারা-৬৪ এবং পেন্জামো-৬২। উভয় গমের দানা মাঝারী লালচে ও গমের শীষে শুয়োযুক্ত। এসব গাছ ছোট হয়, পাতা ঘন সবুজ ও পুরু। গাছ অধিক কুষীযুক্ত।

*৩। সোনারা-৬৪ জাতটি ১০৫—১১০ দিনে পাকে এবং পেনজামো-৬২ জাতটি ১১৫-১২০ দিনে পাকে। স্থানীয় গমের চেয়েও পেনজামো-৬২ পনর দিন আগে পাকে।

*৪। আরও তিনটি নূতন জাতের ভাল গমের নাম উল্লেখ করা হল যাদের ফলন ও অন্যান্য গুণাগুণের দিক থেকে বিশেষ আশাপ্রদ। এদেরও কিছু কিছু বীজ এ বছর পাওয়া যাবে।

ক) মেক্সিপাক-৬৫ (মেক্সিপাক সাদা) ১১৫-১২০ দিনে পাকে, ছড়া বড় ও ঘন সূয়াযুক্ত, দানা মাঝারী এবং সাদা।

খ) ইনিয়া ৬৬ ১০০-১০৫ দিনে পাকে, ছড়া বড় গাঁথুনী পাতলা, দানা বড় ও লালচে, সূয়াযুক্ত। গাছের পাতার গোড়াতে লাল রং দেখা যায়।

গ) নরতিনো-৬৭ অনেকটা ইনিয়া-৬৬-এর মতই, তবে এদের পাতার গোড়ায় লাল রং নেই।

*৫। এ সকল গম রাষ্ট বা মরিচা রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা সম্পন্ন।

কোন্ সময় বীজ বপন করবেন ?

*১। গম বোনার সব চেয়ে ভাল সময় হ'ল অগ্রহায়ণ মাসের ১লা তারিখ থেকে অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত।

*২। অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ তারিখের পর বীজ বুনলে ফসল দেরীতে হয় এবং শেষের দিকে গরম হাওয়া বইতে শুরু করে বলে রসের অভাব বশত: দানাগুলো পুষ্ট হতে পারেনা। তা'ছাড়া কাল বৈশাখী শুরু হলে শীলাবৃষ্টিতে গমের সমূহ ক্ষতি হ'তে পারে।

*৩। রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার উত্তর অন্চলসমূহে কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই গম বোনা চলে।

কিরূপ জমি হওয়া দরকার ?

*১। একেবারে লবণাক্ত, কাঁকর ও স্যাঁৎসেঁতে কাদামাটি ভিন্ন অন্য যে কোন মাটিতে গম চাষ করা যায়। এদেশে পলি পড়া ও বেলে-দো-আঁশ মাটিতে গমের ফলন ভাল হয়।

*২। যে সব জমিতে সেচের পর পানি জমে [থা]কতে পারে সে সব জমিতে গমের চাষ করা চলেনা।

*৩। সেচের সুবিধাযুক্ত জমিতে গমের চাষ করা [ভা]ল। সেচের সুবিধা না থাকলে মেকসিকান গম চাষ [ক]রে বেশী ফলন আশা করা যায় না।

[জ]মি কি ভাবে প্রস্তুত করতে হবে ?

*১। কার্তিক মাসের শেষ কিংবা অগ্রহায়ণ [মা]সের শুরুতে জমিতে জো হলেই পর পর আড়াআড়ি [ভা]বে গভীর করে দু টা চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে ঢেলা ভাঙ্গতে হবে।

*২। সেচের সুবিধানুযায়ী পরিমাণ মত সার জমিতে সমভাবে মাটিতে ছিটিয়ে এরপর আবার দু'টা চাষ ও মই দিয়ে সার ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

*৩। বড় বড় ঢেলা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিতে হবে ও জমি সমতল করতে হবে। কোথায়ও নীচু বা চাপা থাকলে সে সব স্থানে পানি জমে গমের ফলনের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বিঘাপ্রতি কতটুকু সার দেবেন ?

*জমিতে কতবার সেচ দিতে পারবেন তার উপর নির্ভর করছে বিঘাপ্রতি সারের পরিমাণ।

সেচ	জমি প্রস্তুতের সময় বিঘাপ্রতি সারের পরিমাণ			চারা গজাবার ২৫-৪০ দিনের ভিতর পুনরায় বিঘাপ্রতি সারের পরিমাণ
	ইউরিয়া	ট্রিপল সুপার ফসফেট	মিউরেট অব পটাশ	
৪টা পুরাপুরি সেচের জন্য	২০ সের	৩৩½ সের	২০ সের	১২ সের ইউরিয়া
২টা পুরোপুরি সেচের জন্য	১৫ সের	২৫ সের	১২ সের	৮½ সের ইউরিয়া
যা সব জমিতে রস থাকে কিন্তু সেচের সুবিধা নেই	২২ সের	১২½ সের	৬ সের	—

[ক]োথা থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন ?

*১। আপনার এলাকায় গত বছর যে সকল [কৃ]ষক মেকসিকান গমের চাষ করেছে তাদের নিকট [ভা]ল বীজ থাকলে (অর্থাৎ রোগমুক্ত, ভাল পরিপক্ক ও [শু]কনা বীজ এবং ভালভাবে গুদামজাত করা বীজ [স]ংগ্রহ করতে পারেন।

*২। সরকারী খামার কিংবা কৃষি উন্নয়ন সংস্থার [খা]মার কিংবা গুদাম থেকে বীজ সংগ্রহ করতে পারেন।

*৩। নিকটস্থ কৃষি কর্মচারীর সাথে আগে থেকে [য]োগাযোগ করে তার সহযোগিতাও নিতে পারেন।

বিঘাপ্রতি কতটুকু বীজ দরকার ?

*বিঘাপ্রতি তের সের ঝাড়া বাছা পরিষ্কার বীজ দরকার (ছোট ছোট দানা ও পোকা খাওয়া দানা ঝেড়ে বেছে ফেলে দিতে হবে)। এসকল বীজের অঙ্কুর উদ্গমের ক্ষমতা যেন শতকরা ৮৫ ভাগের বেশী থাকে।

শোধিত বীজ না পেলে কি ভাবে শোধন করতে হবে ?

*১। এ ব্যাপারে নিকটস্থ কৃষি কর্মচারীর পরামর্শ নেবেন।

*২। ১ মণ ঝাড়া ও বাছাই করা গমের বীজ আড়াই তোলা 'গ্রানোসান এম' নামক এক প্রকার বিষাক্ত ঔষধ দিয়ে শোধন করতে পারেন। ১৩ সের

বীজের জন্য পৌনে এক তোলার সামান্য বেশী ঔষধ প্রয়োজন। এই ঔষধ গমের বীজের সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে।

*৩। 'সীড-ট্রিটারের' সাহায্যে একাজ ভালভাবে করা যায়। ইহার অভাবে অকেজো কোন বড় শুকনা হাঁড়িতে বীজ নিয়ে উহার ভিতর ঔষধ দিয়ে একটি কাঠির সাহায্যে ভালভাবে নেড়েচেড়ে ঔষধগুলিকে প্রতিটি বীজের সাথে ভালভাবে লাগাতে হবে। ঐ হাঁড়ি অন্য কোন কাজে ব্যবহার করবেন না।

*৪। বীজ শোধন হ'লে গমের চারায় রোগের সম্ভাবনা কম থাকে।

*৫। শোধিত বীজ কোন অবস্থায় আপনার অথবা আপনার হাঁস-মুরগীর খাবার হিসাবে ব্যবহার করবেন না। বীজ বুনবার পর অতিরিক্ত বীজ থেকে গেলে উহাদের অন্য জমিতে বুনে দেবেন অথবা পুড়ে ছাই করে ফেলবেন। পরে সাবান দ্বারা হাত ভালভাবে ধুয়ে ফেলবেন।

কিভাবে বীজ বুনবেন?

*১। জমি ভালভাবে তৈরী হবার পর শোধিত বীজ জমিতে সমভাবে ছিটিয়ে দিন।

*২। তারপর জমি হালকাভাবে চাষ করে দিন যাতে বীজ মাটির দু'ইন্চির বেশী নীচে চলে না যায়। তারপর হালকাভাবে মই দিতে হবে।

*৩। 'সীড্ড্রিলারে'র সাহায্যে ১০।১২ ইঞ্চি দূরে দূরে সারিতেও বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে জমিতে আগাছা বাছাই করা ও নিড়ি দেওয়া সহজ হয়।

কেমন করে চারার যত্ন নেবেন?

*১। ৪।৫ দিনের মধ্যে বীজ গজিয়ে যাবে। এ সময় যদি বৃষ্টি হয়, জমিতে কোনরূপ পানি যাতে দাঁড়াতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখবেন।

*২। বীজ লাগাবার পর পাখীতে বীজতলে যেতে পারে। রাতের বেলা ইঁদুর, খরগোস ইত্যাদি বীজ অথবা চারাগাছ নষ্ট করিতে পারে। পিঁপড়া, উঁইপোকা কিংবা উরচুঙ্গাও বীজ অথবা চারাগাছের ক্ষতি করতে পারে। এসবের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে অথবা আক্রমণ করে থাকলে নিকটস্থ কৃষি কর্মচারী কিংবা শস্য সংরক্ষণ কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে জমিতে ঔষধ ছিটিয়ে দিবেন।

*৩। চারা ছোট থাকতে যদি জমিতে বেশী রস থাকে বা বৃষ্টি হয় অথবা তাপমাত্রা বেড়ে যায় তবে রোগ দেখা দিতে পারে। পূর্ব থেকেই কৃষি কর্মচারী অথবা শস্য সংরক্ষণ কর্মচারীর পরামর্শানুযায়ী কাজ করুন। শোধিত বীজে রোগের আক্রমণ কম হয়।

*৪। চারার বয়স ১৫।১৬ দিন হলে যদি জমিতে আগাছা হয়, তাহলে নিড়ানী দিয়ে তা পরিষ্কার করে দেবেন। আগাছা না হলেও জমি নিড়িয়ে মাটি আলগা করে দেবেন।

কখন কখন সেচ দিতে হবে?

*১। মাটি একেবারে খনখনা শুকনা হবার বেশ পূর্বেই সেচ দিতে হবে। ২০।২৫ দিন পর থেকে দেখুন জমিতে রস আছে কিনা? যদি তখন রস না থাকে তবে নূতন কুষী বেড় হতে পারবেনা। তাতে ফলনও কম হবে।

*২। যে জমিতে চার বার সেচ দিবেন সেখানে গাছের বয়স ২০।২৫ দিন হলে প্রথমবার, ৩৪।৩০ দিনে দ্বিতীয় বার, ৫০।৫৫ দিনে তৃতীয়বার এবং ৬৫।৭০ দিনে অথবা ফুল ফোটাবার সময় চতুর্থবার সেচ দেবেন। বৃষ্টি হলে পানি সেচের পরিবর্ত্তন হতে পারে।

*৩। যেখানে দু'বার সেচ দেবেন সেখানে গাছের বয়স ২০।২৫ দিন হলে প্রথমবার ও ৫০।৫৫ দিনে দ্বিতীয়বার সেচ দেবেন। অবশ্য গাছ থোরমুখী হলে জমিতে রস না থাকলে আবারও পানি সেচ করতে হবে। দানাতে দুধ আসা পর্যন্ত জমিতে রস থাকতে হবে, নচেৎ দানা ভালভাবে বাঁধবেনা।

*৪। প্রতিবার সেচের সময় জমির ৩।৪ ইঞ্চি মাটি নিচ পর্যন্ত যেন ভালভাবে ভিজে যায়।

অন্যান্য কি কি যত্ন নেওয়া দরকার?

**১। চারা গজানোর ২৫—৪০ দিনের ভিতর পরিমাণ মত ইউরিয়া সার জমিতে ছিটিয়ে দিন। দুপুর কিংবা বৈকালে অর্থাৎ যখন গাছের পাতা শুকনা থাকবে তখন সার দেওয়া উচিৎ।

**২। যে জমিতে সেচ দেওয়া হবেনা, সেখানে পরে কোন প্রকার সার দেওয়ার দরকার নেই।

*৩। সার দেবার পূর্বে আগাছা সাফ করা দরকার এবং পরে সেচ দেওয়া দরকার।

*৪। জমিতে গাছ ছোট অবস্থায় থাকা কালীনই ২।৩ বার জমি নিড়িয়ে দিতে হবে ও আগাছা দেখা দিলে পরিষ্কার করতে হবে।

*৫। রোগ বা পোকা-মাকড় দেখা দিলেই অথবা সম্ভাবনা থাকলে কৃষি কর্মচারী কিংবা শস্য সংরক্ষণ কর্মচারীর পরামর্শানুযায়ী জমিতে ঔষধ ছিটাতে হবে।

*৬। কাল রং এর ছড়া দেখা মাত্র উহা জমি থেকে তুলে পুড়ে ফেলতে হবে।

*৭। ফুল আসার পর থেকে দরকার না পড়লে জমিতে ঢুকবেন না।

কখন ফসল কাটবেন ও কিভাবে মাড়াই ও গুদামজাত করবেন?

*১। গম পেকে গেলেই জমি থেকে কেটে নিন। দুপুর বেলা রোদের তাপ শীষের 'তুষ'গুলো যখন ফাক হয়ে আসে তখনই ফসল কাটার সময়।

*২। মেক্সিকান গমের গাছ পাকার পর জমিতে রাখবেন না, তাতে গমের দানা ঝড়ে যাবে।

*৩। মেক্সিকান গম কেটে এনে ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে ধান মাড়াই পদ্ধতিতে গম মাড়াই করবেন। গম মাড়াই করতে ধানের চেয়ে দ্বিগুণ সময় লাগে।

*৪। গম ঝেড়ে বেছে ভাল করে শুকিয়ে নিন, শুকনো গম ঠাণ্ডায় রেখে তারপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লেপা গোছা গোলাতে ভরে রাখতে পারেন। আপনার প্রয়োজন মত মেক্সিকান গমের বীজ এখনই সংগ্রহ করুন। অন্যান্য খবরের জন্য আপনার নিকটস্থ কৃষি কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করুন।

লেখক-লেখিকাদের জন্য একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

কৃষিকথার জন্য প্রেরিত কোন রচনা কৃষিকথায় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে যদি অন্যত্র মুদ্রিত হয় তবে উহা কৃষিকথায় পুনর্মুদ্রিত হওয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনা সাপেক্ষ থাকবে। উল্লেখযোগ্য যে, অন্যত্র প্রকাশিত কোন রচনা কৃষিকথায় পুনর্মুদ্রিত হলেও উহার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না।

চীফ টেকনিক্যাল ইনফরমেশন অফিসার,
কৃষিতথ্য কেন্দ্র, পূর্ব পাকিস্তান,
ঢাকা।

ভাবের হতে লেনদেন

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

প্রধান ছয়টি উপাদান

ভাববিনিময়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো অন্যকে নিজের কথা বুঝানো বা অন্যের কাছ থেকে কিছু জেনে নেওয়া। অন্য কথায় শেখা, শিখানো বা জানা বা জানানো বলা যেতে পারে। একাজে যেসব বিষয় জড়িত ওসবকে প্রধানতঃ ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। এ ছ'টিকে ভাবের আদান-প্রদানের চাবিকাঠি বলা চলে। এসব চাবিকাঠি সম্বন্ধে যার জ্ঞান যত বেশী হবে ভাবের আদান-প্রদানে তিনি ততই কার্যকরী হতে পারবেন। তাই প্রথমে ঐ ছ'টি বিষয়ের উল্লেখ করে পরে প্রত্যেকটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

১। যিনি ভাববিনিময় করেন তাকে 'বক্তা' বা 'প্রেরক' (Communicator) বলা যায়।

২। তিনি যা বলতে চান তাকে 'বাণী বা বিষয়' (message) বলা যায়।

৩। যে সব মাধ্যমে বাণী পাঠানো হয় সেগুলোকে 'সেতু' (channel) বলা চলে।

৪। কি কলা-কৌশলে বাণী পাঠানো হবে তাকে বাণী পাঠানোর 'ব্যবস্থাপনা' (Treatment of message) বলা যায়।

৫। যার কাছে বাণী পাঠানো হবে তাকে 'শ্রোতা' (Receiver বা audience) বলা চলে।

৬। 'শ্রোতা' কি ভাবে বাণীকে গ্রহণ করলো তাকে 'সাড়া' (Response) বলা হয়।

১। বক্তা—

বক্তা বা প্রেরক হলো ভাববিনিময়ের উৎস। তার কাছ থেকে 'বাণী' সুরু হয়। বক্তা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার ও জানবার আছে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এসম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথার উল্লেখ করতে চাই। কে বাণী দিচ্ছেন, সামাজিক জীবনে তার স্থান ও দান, তার বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞানের পরিধি আন্তরিকতা ইত্যাদির সাথে ঐ বাণীর উদ্দেশ্য কি তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উদাহরণ নিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। একই কথা শিশুর মুখ হতে শুনে যে ভাবে গ্রহণ করা হয়, বড়দের কাছ থেকে শুনলে সে ভাবে তা গ্রহণ করা হয় না। কোন রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর দেশের কৃষি উন্নয়ন সম্বন্ধে কোন কথা বল্লে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, নিম্নপদস্থ কর্মচারীর কাছে শুনলে অনুরূপ গুরুত্ব আরোপিত হয় না। এ নিয়ে কথা বাড়াচ্ছিনা। বক্তার জন্য

...ভাবে সম্প্রসারণ কর্মীর বেলায় সবচেয়ে গুরুত্ব-... কথা হলো যে, তার বাণী কল্যাণের বাণী, মঙ্গলের ... এই বিশ্বাস জন্মাতে অপারগ হলে সব চেষ্টাই ... হবে। এজন্য বক্তাকে যে সব বিষয়ে সজাগ ও ... থাকবে যে সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাক।

১। তাকে জানতে হবে ও স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে—

- নিজের 'বাণীর' উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে।
- শ্রোতার প্রয়োজন, পটভূমি, সামর্থ ইত্যাদি।
- কি উপায়ে 'সেতু' শ্রোতার কাছে পৌঁছা যাবে ও উদ্দেশ্য হাসেল হবে।
- 'বাণী' পাঠানোর ব্যবস্থাপনা এবং সুযোগ-সুবিধা ও বাঁধা-বিপত্তি ইত্যাদি বিষয়ে।

২। তাকে সর্বদা সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হবে—

- শ্রোতার মংগল বিধানে।
- বিশেষ বাণীটি কি ভাবে শ্রোতাকে সাহায্য করবে।
- তাকে ভাববিনিময়ের কলাকৌশল এবং এসবের গুণাগুণ, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং কি ভাবে ক্রমাগত নিজের পারদর্শিতা বাড়ানো যায়।

৩। তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে—

- পূর্ব থেকে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরীর জন্যে।
- কি ধরনে মাল-মশল্লা ব্যবহার করা যায়।
- প্রতি স্তরে অগ্রগতির মূল্যায়নের জন্যে।

৪। তার বিদ্যা-বুদ্ধি থাকতে হবে—

- বাণী নির্বাচনের ও বাণীকে সঠিকভাবে পৌঁছানোর।
- মৌখিক বা লিখিত যে ভাবেই হোক বাণী প্রকাশের শক্তি সামর্থের।
- সেতু নির্বাচন ও শ্রোতার প্রয়োজন বুঝার।
- ফলাফল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত যে কোনটাতে অমনোযোগী হলে বা অন্য কোন কারণে ব্যর্থতা প্রকাশ পেলে, ভাববিনিময়ে বিফলতা আসতে পারে। সুতরাং ভাল বক্তা বা প্রেরক পূর্বাহ্নেই সর্বতোভাবে তৈরী হতে থাকেন।

"জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন অপরিহার্য। খাদ্য দু'উপায়েই সংগ্রহ করা যায়—হালাল ও হারাম। হালাল খাদ্য সংগ্রহ ও তা হালালরূপে গ্রহণের জন্য সর্বদা সতর্কতার সাথে জীবন-যাপন করতে হয়। যেমনঃ তোমার গাভীর দুগ্ধ হালাল—তোমার হালাল উপার্জিত অর্থে বা পরিশ্রমে যদি গাভী প্রতি-পালিত হয়ে দুগ্ধ প্রদান করে, তবে তা তোমার জন্য হালাল; আর যদি তোমার গাভী অন্যের শস্য খেয়ে দুগ্ধ দান করে তবে তা' হারাম।"

—আল্-হাদিস

পশু পরিচিতি

এম এ খালেক

ঘোড়া

তিন জাতের ঘোড়া পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। যেমন—আরবীয় ঘোড়া, ইংল্যাণ্ডের ঘোড়া ও অষ্ট্রেলিয়ার ঘোড়া। ঘোড়া প্রভূভক্ত প্রাণী। এরা মানুষের যান বাহনের

লাহোরের জাতীয় অশ্ব ও গো প্রদর্শনীতে 'ঘোড়ার নাচ'।

কাজে আদি যুগ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঘোড়ার কেশর, মাথার ঝুটি ও লেজের লোম লম্বা ও গায়ের লোম ছোট ও মস্থণ। ঘোড়া শক্তিশালী ও দ্রুতগামী প্রাণী। আমাদের পল্লী অঞ্চলে অনেক লোক ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক স্থান হতে অন্যস্থানে গমনাগমন করে থাকে। পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে ঘোড়া পোষা হয়। কিছুদিন পূর্বেও শহর অঞ্চলে অনেক ঘোড়া দেখা যেত। যান্ত্রিক যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শহর হতে ঘোড়া পোষার প্রচলন ক্রমে ক্রমে লোপ পাচ্ছে। দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়ার মত প্রাণী আর দ্বিতীয়টি নেই। ব বড় শহরে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য বেশ কিছু সংখ্য ভাল ভাল ঘোড়া এখনও পালন করা হচ্ছে। প্রতি যোগিতার ঘোড়া চড়া মূল্যে বিক্রী হয়। পৃথিবী বিত্তশালী লোকেরা দৌড়ের ঘোড়ার বড় বড় ফা প্রতিষ্ঠা করেন। রাজশাহী বিভাগের অনেক শহ এখনও ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন আছে। পশ্চিম পাকি স্তানে প্রায় সব জায়গায়ই ঘোড়া দেখা যায়। এ অধিকাংশ ঘোড়াই আরবী-ঘোড়ার বংশধর। গা ছাড়াই এরা অনায়াসে ৩।৪ মণ মাল এক স্থান হ অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারে।

কাঁচা ঘাস ও ছোলা গোড়ার প্রধান খাদ্য অনেকেই ঘোড়াকে শুধু কাঁচা ঘাস খাইয়ে রাখে ফলে অল্প দিনের মধ্যে ঘোড়ার স্বাস্থ্য খারাপ হ পড়ে। ঘাসের সঙ্গে ঘোড়াকে গমের ভুষি, চালে কুঁড়া ও যব খেতে দেওয়া উচিত। ঘোড়াকে এ সঙ্গে বেশী খেতে দিতে নাই। পরিমাণে কম, বা বেশী এই নিয়মে এদের খাওয়াতে হয়।

উন্নত ঘোড়ার জন্য উন্নতমানের খাদ্য অবশ্যই দরকার। ১৬০০-১৮০০ পাউণ্ড ওজনের একটি ইংলিশ ঘোড়ার খাদ্য তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

খাদ্য	পরিমাণ
যব (ওট)	১২ পাউণ্ড
গমের ভুষি	৪ ,,
যবের চাফ	৪ ,,
হাড়ের চূর্ণ	২ আউন্স
লবণ	২ ,,

উপরোক্ত খাদ্য চার বারে খাওয়াতে হয়। বৈকালিক খাদ্যের সঙ্গে তিসির তৈল ½ আউন্স এবং তিসির জেলি ½ পাউণ্ড মিশে খাওয়াতে হয়।

দৌড়ের ইংলিশ ঘোড়ার খাদ্য তালিক—

খাদ্য	পরিমাণ
যব (ওট)	১৪ পাউণ্ড
গমের ভুষি	২ ,,
চাফ	২ ,,
লিন সিড জেলী	½ ,,
লিন সিড ওয়েল	½ আউন্স
লবণ	২ ,,
বোনমিল	২ ,,

এইগুলি একত্র করে ৪ (চার) বার খাওয়াতে হয়। তিসির তৈল এবং তিসির জেলী রেসের (দৌড়) দিনে খাওয়াতে নাই।

ট্রেনিং এর সময় একটি ১২০০-১৪০০ পাউণ্ড ওজনের আরবী ঘোড়ার খাদ্য তালিকা—

খাদ্য	পরিমাণ
যব (ওট)	৯ পাউণ্ড
গমের ভুষি	৩ ,,
চাফ	৩ ,,
হাড় চূর্ণ	২ আউন্স
লবণ	২ ,,

উল্লেখিত খাদ্য চারি বারে খাওয়াতে হয়। তিসির তেল ২ আউন্স এবং তিসির জেলী বৈকালিক খাদ্যের সাথে মিশ্রিত করে খাওয়াতে হয়।

দৌড়ের আরবী ঘোড়ার খাদ্য তালিকা—

খাদ্য	পরিমাণ
যব (ওট)	১২ পাউণ্ড
গমের ভুষি	১ ,,
চাক	১ ,,

অন্যান্য জিনিষ ইংলিশ ঘোড়ার মতই।

এই অণুপাতে দেশী ঘোড়ার খাদ্য প্রায় অর্দ্ধেক দিতে হয়। রুচি অনুযায়ী খাদ্যের কমবেশী করা যায়। আবশ্যকানুযায়ী কোন দ্রব্যের রদবদল করা যায়।

ঘোড়ার জন্য আরও একটি খাদ্য তালিকা—

খাদ্য	পরিমাণ
যব (ওট)	৩ পাউণ্ড
গমের ভুষি	১ ,,
কচি গাছ বেরোনো ছোলা	২ ,,
গাজর	২ ,,
কডলিভার তেল	½ আউন্স
হাড়ের চূর্ণ	½ ,,
লবণ	১ ,,
	১০ পাউণ্ড

দিনে তিন বার ৯টা, ১টা, ৫টায় খাওয়াতে হয়। মধ্যম রকমের কার্যে নিযুক্ত ঘোড়ার খাদ্য তালিকা—

যব (ওট) ১০ পাউণ্ড ও 'হে' (কাচা ঘাস শুকানোর পর ছোট ছোট টুকরা করা)—১০ পাউণ্ড।

পূর্ণ মাত্রায় কার্যে নিযুক্ত ঘোড়ার খাদ্য তালিকা—

যব (ওট)—১৪ পাউণ্ড, গমের ভুষি-২ পাউণ্ড, 'হে' ১২ পাউণ্ড ও গাজর ৩ পাউণ্ড।

গাভীর ঘোড়ার খাদ্য তালিকা—

যব (ওট)—৪ পাউণ্ড, ছোলা (ভিজান)—৪ পাউণ্ড, গমের ভুষি ৩ পাউণ্ড এবং 'হে'—১২ পাউণ্ড।

নিয়মমত সুষম খাদ্য খাওয়ালে ঘোড়ার ব্যারাম-ব্যাধি কম হয়। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সব সময় তারা সন্তোষজনক কাজ করতে পারে।

ঘোড়া যতক্ষণ কাজে থাকে ততক্ষণ তার কাজের অভ্যাস বজায় থাকে। দৌড়ের ঘোড়ার জন্য ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রেস বা দৌড় যখন না থাকে তখন ব্যায়াম অপরিহার্য। ব্যায়াম করলে তার অভ্যাস বহাল থাকে।

—:—

জমাট বাঁধা অশ্রু

ফারুক আহমদ

প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্প তার সাধের পৃথিবীটাকে ওলট-পালট করে দিল। হৃদয়টাকে যেন কেউ শক্ত পাথরে আছড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তার যদি জাফর তালুকদারের মত একশ বিঘা জমি থাকত, তাহলে এ দুর্ভাগ্যটুকু তার ঘাড়ের ওপর ভূতের মতো চাপতে পারত না। কেন, কেন সে গরীব বাপের ঘরে মাত্র পাঁচ-বিঘা সম্পত্তির উত্তরাধীকারী হয়ে জন্মাল? দুঃখে অভিমানে তার চোখ জ্বালা পোড়া করছে কিন্তু তাতে পানি নেই। সব পানি জমে বরফের পাথর হয়ে যেন তার বুকের ভেতরে জমাট বেঁধে আছে। তখনও তার কানে করিমুল্লা মাতুবরের কাটা কাটা কথাগুলো বেসুরাভাবে বাজছে। মাতুবরের কথার জবাব সে কিছুই দিতে পারে নি। দেবার বা কি ছিল। ঠিকই তো রাবেয়াকে বিয়ে করার জন্য সে হাজার টাকার গয়না জোগাড় করতে পারবে না। তার ভাঙ্গা ঘরটায় গাঁয়ের মাতুবরের মেয়ে থাকবেই বা কি করে? রহমতের মতো একটা দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ রাবেয়াকে সুখে রাখতে পারবে না। তাই করিমুল্লা মাতবর আজ পষ্টা-পষ্টি জানিয়ে দিয়েছে তার মেয়েকে রহমতের মতো ছেলে কোনদিন যেন বিয়ে করার আশা না করে।

কিন্তু মাতুবর তো জানেনা, সে রাবেয়াকে কতটুকু ভালবাসে। তার ঝাঁঝরা কলজেটা খুলে দেখাতে পারলে মাতবর হয়তো আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারত। অবশ্য রাবেয়া একথা জানে এবং জানে বলেই তো একদিন সে সেই জামতলার নীচে দাঁড়িয়ে বলেছিল "তোমারে ছাড়া আমি বাঁচুম না. রহমত ভাই"!

কয়েকদিন থেকে রাবেয়ার সঙ্গে দেখা করার কোন উপায় নাই। মোড়ল টের পাওয়ার পর তার মেয়েকে বাড়ী থেকে বের হতে দেয় না। দেখা হলে হয়তো তাকে জিজ্ঞাসা করত, তারও বুকটা কি রহমতের মতো ভেঙ্গে খানখান হয়ে যেতে চাইছে? রহমতের মনে হলো, যদি এমন হতো যে, সেই আলাদিনের দৈত্যের মতো একটা জিন তার কথা শুনতো, তাহলে সে প্রথমেই রাবেয়াকে তার কাছে এনে দিতে বলতো।

তার মুখের রেখাগুলো হঠাৎ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ফুটে উঠলো। যেমন করেই হোক মাতবরের কথার যোগ্য জবাব সে দেবে। কিন্তু কি করে? এতগুলো টাকা সে পাবে কোথায়? তখনি তার মনে হলো, শহরে গিয়ে সে টাকা রোজগার করবে, অনেক টাকা। মোহর আলী বেপারী শহরে গিয়ে দুদিনেই বড়লোক হয়ে গেল। আগে ছিল ছোট বেপারী। এ-বাজার থেকে ও-বাজারে নিয়ে জিনিস বিক্রি করতো; কিন্তু এখন সে শহরে বিরাট দোকানের মালিক।

স্বপ্ন দেখল, সে অনেক টাকা রোজগার করে ফিরে এসেছে। আর দর্পভরে সেগুলো করিমল্লা মাতবরের সামনে ফেলে দিয়ে বলছে, "এই লন গয়নার লাইগ্যা হাজার টাকা। রহমতের লাইগ্যা কোন কাম আইট্‌কা থাহে না।" তারপর সকলের অবাক চোখের সামনে রাবেয়াকে বিয়ে করে নিয়ে এল তার নুতন বানানো সুন্দর ঘরটায়।

পরদিন রওয়ানা হলো শহরের দিকে। কিন্তু কোথায় উঠবে সে! কোথায়ই বা কাজ খুঁজবে, যেখানে রোজগার করতে পারবে অনেক, অনেক টাকা। তার এক বন্ধু ছিল জলিল। শহরে কি যেন চাকুরি করত। খুঁজতে খুঁজতে হাজির হলো তার আস্তানায়।

শহরে অনেক জায়গায় সে একটা সুবিধামত কাজ জোগার করতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার পোড়াকপাল বোধহয় জোড়া লাগলো না। কয়েক ঠোঙ্গা মুড়ির সদগতি ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারল না। তার আশার মুখে ছাই পড়ল। তার স্বপ্ন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে

র খানখান হয়ে গেল। একরাশ দুঃখ নিয়ে আবার নায় ফিরল সে।

"কি মুখখানা এত কালা কইরা আইছ ক্যান? হু অইল না বুঝি? তা হের লাইগ্যা মন স্না কি অইব।" বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে সে তাকে কিছু খুলে বলল। কিন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস যোগ ছাড়া তার আর তেমন কিছু করার উপায় নেই।

চল তোমারে এক অফিসে লইয়া যামু। একবার চেষ্টা কইরা দেহ, হেই অফিসে আমার চিনা অফিসার সাব আছে। বড় ভালা মানুষ। হের গিয়া দেহি। কপাল ভালা থাকলে চাকুরী রা যাইবার পার।"

তার পরদিন। রহমত রওয়ানা হলো তার বন্ধুর অফিসারের খোঁজে। আশা-নিরাশায় দোলায়িত মন। ভাগ্য ভাল, সেই অফিসারের দেখা লো। মুগ্ধ হলো তার ব্যবহারে। বড় অফিসার ও তাদের মতো লোকের সঙ্গে আপন জনের মত বলছেন। কিন্তু তিনি জানিয়ে দিলেন তার ফিসে সেরকম কোন চাকরী খালি নেই। তারপর নের দিকে চেয়ে বললেন "তুমি তো জানই, কাল চাকরীর বাজার কিরকম ভীর। ভাল টাশ না থাকলে চাকরীর আশাই করা যায় না।

তিনি যেন কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন। তারপর তের দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা তোমার বাড়ীতে জমিজমা কিছুই নেই।"

—আছে হুজুর।

—তাহলে তুমি চাকরী খুঁজতে এসেছ কেন? তার হ যেন খানিকটা অবাক লাগল।

—মাত্র পাঁচ বিঘা জমি আমাগো। হেই জমিতে বছরে একবারে যা ধান হয় তা দিয়ে আমাগো নই কুলান যায় না।

—আচ্ছা, তুমি একটা কাজ করনা?

—কি কাম হুজুর। একটা কাম পাইলে আমি চ্যা যাই। রহমতের মনে আশার আলোটা বিদ্যুতের চমকে উঠল।

—তোমার বাড়ীতে গিয়ে তোমার জমিতেই উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ কর।

—এই সমান্য জমিতে চাষ কইর‍্যা আর কি হইব। ক্ষেত তো বহুতদিন থাইক্যা করতাছি। আমার বাপেও কইর‍্যা আইছে। কিন্তু আমাগো অবস্থা কোনদিন ভালা অয় নাই। রহমতের আশার আলোটা যেন বিদ্যুতের নয়, চকমকি পাথরের। যে আলো তার হতাশার অন্ধকার দূর করতে পারব না।

—দেখ তুমি যদি অল্প জমিতেও ভালভাবে চাষ করতে পার তবে অনেকগুণ বেশী ফসল পাবে। আমাদের কথামত চাষাবাদ করে অনেক চাষী অনেক বেশী ফসল পাচ্ছে। তুমিও যদি চেষ্টা কর, তুমিও পাবে।

—কিন্তু রহমত বুঝে উঠতে পারল না কি করে এত কম জমিতে কতটুকুই বা বেশী ধান হবে। সাহেব তো জানে না তার অনেক টাকার দরকার। যা দিয়ে সে মোড়লকে সন্তুষ্ট করতে পারবে আর তার চির আকাঙ্খিত মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারবে।

—তোমার জমিতে যদি ঠিকমত সার দাও, উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ কর, পোকামাকড় আর রোগের হাত থেকে ফসলকে বাঁচানোর জন্য ঠিকত ওষুধ দাও আর দরকার মত পানিসেচ কর তাহলে তুমি এই কম জমিতেই বেশী করে ফসল পাবে।

—অফিসারের কথায় রহমতের চিন্তার সূত্র কেটে গেল।

—কিন্তু এই যে সার, পানিসেচের কল আরও সব জিনিষপত্র কিনার টাকা পামু কেমনে?

—টাকা আমরা দেব—হেসে বললেন অফিসারটি। ভাবখানা যেন তিনি টাকা দেওয়ার জন্যেই বসে আছেন।

—আপনে কেন টাকা দিবেন; আমার টাকা দিয়ে আপনার কি লাভ? রহমতের যেন কিছুই বিশ্বাস হতে চায় না। "আর টাকা নিয়ে পরে আপনারে ফিরত দিমু কেমনে?"

—তুমি তাহলে কিছু জাননা। টাকা আমি দিতে যাব কেন। টাকা দেবে কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। চাষীরা ভালভাবে চাষাবাদ করার জন্য যাতে তাদের টাকা পয়সার অভাব না হয় সেজন্য সরকার কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে টাকা ধার দেবার বন্দোবস্ত করেছেন। এখান থেকে চাষীরা টাকা ধার নিয়ে সার, ভালবীজ, পানি-সেচের জন্য দমকল, কলের লাঙ্গল ইত্যাদি কেনে। তারপর ফসল পেলে বছর বছর নামমাত্র সুদে সেই টাকা শোধ করে। তুমি যদি চাও সব ব্যবস্থা করে দেব আমি।

রাজি হলো রহমত। সাহেব যখন এত করে বলছেন তখন একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

—আচ্ছা তুমি তো সারাবছর একটা ফসল ফলাও, তাই না? রবি মৌসুমে জমিটা তো পড়েই থাকে।

—কি করমু সাব। শীতের সময় পানি পামু কেমনে?

—তাহলে তুমি এবার রবি মৌসুমে তোমার জমিটায় আলু লাগাও। পানির ব্যবস্থা আমরা করে দেব। আশ্বাস দিলেন অফিসারটি। তারপর বুঝিয়ে দিলেন, সমবায় পদ্ধতিতে কি ভাবে চাষাবাদ করতে হয়।

রহমত তাদের এলাকার কৃষি অফিসারের সাহায্যে তার গ্রামে একটা সমবায় সমিতি গড়ে তুলল। যাদের জমি কাছাকাছি তারা অনেকেই সমিতিভুক্ত হলো। তারপর সেই সমিতির মাধ্যমে কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিল। তারা পানিসেচের জন্য দমকল কিনল, কলের লাঙ্গল কিনল, সার কিনল। সেই অফিসারটি নিজে তাদের গ্রামে এসে সব বুঝিয়ে দিলেন।

—দেখ, আলুচাষ করতে হলে কয়েকটা ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হয়। প্রথম কথা ভাল জাতের আলু-বীজ বেছে নিতে হয়। যে জমিতে রোগ বা পোকার আক্রমণ হয়েছিল সেখান থেকে আলুবীজ নিতে নেই। আলুবীজ এক থেকে ডেড় ইঞ্চি মোটা হওয়া উচিৎ। তারচেয়ে বড় আলু কেটে লাগানো যায়। তবে কেটে লাগানোর অন্ততঃ ১ দিন আগে কেটে ছায়ায় রাখা উচিত। তাহলে কাটা যায়গায় পোকামাকড় আক্রমণের ভয় থাকে কম। তাছাড়া কাটা অংশে পরিস্কার ছা লাগিয়ে দিলে আরও ভাল হয়।

তারা সব কাজ করল। কৃষি অফিসারের কথামত স দিল দরকার মত। প্রথম জমি তৈরী করার সময় এক প্রতি গোবর ১০০ মণ, খৈল ৩ মণ, টি, এস, পি ২ মণ, মিউরেট অব পটাস ১ মণ। গোবর ছা বাকী সব দেয়া হলো আলুবীজ লাগানো নালার মধ্যে তারপর ২০।২৫ দিন পর লাইন তুলে দেয়ার স ইউরিয়া দেয়া হলো ৩০ সের। দরকার মে পোকামাকড় দমনের জন্য ওষুধ ছিটানো হলে তাদের মধ্যে একজনের জমিতে আলু মড়কে ধরেছি তখন তারা কৃষি অফিসারের কথামত শতকরা এ ভাগ বোর্দো মিক্সার সমস্ত জমিতে ছিটিয়ে দেয়া হ এবং আলুক্ষেত মড়কের হাত থেকে বাঁচানো হলে তাদের ফসলও হলো খুব ভাল।

কিন্তু রহমতের বুকের ভেতর যে পাথরটা জ বেধে ছিল, সেটাকে কিছুতেই নামাতে পারল ন তারপর একদিন যখন সে শুনল রাবেয়ার বিয়ে হ যাচ্ছে, তখন তার বুকের ভিতরটা দপ করে জ্ব উঠল কিন্তু সেটা চেপে রাখা ছাড়া তার কোন উপা রইল না। নিজেকে আরও কাজের মধ্যে ডু দিল।

তাদের জমির তোলা আলুগুলো সঙ্গে সঙ্গে ত বিক্রি করল না। কৃষি অফিসারের কথামত আলু গু জাত করার জন্য মাচা তৈরী করা হলো। মাচা দেড়হাত দূরে দূরে স্তরে স্তরে সাজানো। য আলু তার দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো বালু নেয়া হলে প্রতি সাড়ে বার মণ আলুর জন্য আধসের ১০ ম্যালাথিয়ন নামক ওষুধ বালুর সঙ্গে মিশিয়ে হলো। তারপর প্রত্যেক স্তরের অর্ধেক পরি আলু রেখে বাকীটুকু ওষুধ মিশায়ে বালু দিয়ে ডেকে হলো। তারপর প্রতি ১৫ দিন পরপর আলু পরীক্ষা করে দেখা হলো। সামান্য ভেজা হ সেই আলু সরিয়ে ফেলা হতো। যখন বাজারে দাম চড়ল তখন তারা বাজারে আলুগুলো ভালদা বিক্রি করে আসল।

তারপর রহমতের জীবনের ওপর দিয়ে বছরের রেকগুলো চাকা গড়িয়ে গেছে। এখন তার গোয়াল- গরু আর মাঠভরা ধান। এসব তার চেষ্টার র। সে বিয়ে করেছে ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। মেয়েটা তার কলেজে পড়ে।

রহমত উঠানে দাঁড়িয়ে তার লাল গাইটাকে আদর ছিল। গাইটাও আবেগে আরো গলা বাড়িয়ে য়েছে। সে যেন কি চিন্তা করছিল, হয়তোবা ইটার মতোই পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করছিল। মন। সময় তার স্ত্রী হাঁড়ির মত মুখ করে এসে ড়ালো।

—হুনছ তোমার মাইয়ার খবর। কতদিন কইলাম য়াটাকে তাড়াতাড়ি বিয়া দিয়া দাও। তা হুনলা আমার কথা। লেহাপড়া শিহাইয়া মেমসাব নাইবা। এহন শহরে গিয়া কি অইছে হের খবর হ?

—তুমি এই সাঝের বেলাডা চিল্লাচিল্লি কইরা মাটি রতাছ কেন? কি অইছে হুনি?

—অওনের কিছু বাকি আছে নাহি। জয়নাল হরে গেছিল। হে আইয়া কইল, তোমার মেয়ারে নাহি রায়পুরার মনির আলীর পোলার লগে ঘুরতে খছে। ছি ছি! হুইনা আমি লজ্জায় মইরা যাই। তুমি কাইল গিয়াই বকুলরে লইয়া আহ। তাড়াতাড়ি কাটা বিয়ার ব্যবস্থা কইরা ফ্যাল।

—ঠিক আছে। আমি কাইল যাইতেছি। তাকে মন বেশ গম্ভীর মনে হলো।

—বিয়ার লাইগ্যা আর চিন্তা কি। লুতু ভাইয়ের পোলাডা দেখতে হুনতে ভালা। আর বাপের যায়গা- জমিও বেশ আছে।

কিন্তু রহমতের পুরোনো দিনের ছবিগুলো মনের পর্দায় ভাসতে লাগল। সে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল যে ক্ষত সে বুকের মাঝে নিয়ে বেড়াচেছ, তার মেয়ের যেন ওরকম না হয়। সে স্থির করল মেয়ের পছন্দমত ছেলেটার সঙ্গেই তার বিয়ে দেবে। তার স্ত্রী শত আপত্তি করতে লাগল "তোমার মাথা খারাপ অইছে? ছেলের বাপ নাই। জমিজমা বলতে কিছু নাই। ছেলের মায় কষ্ট কইরা পড়ার খরচ চালাই- তাছে। হের লগে বিয়া দিয়া মেয়েরে পথে বওয়াইবা নাহি?"

কিন্তু আপত্তি সে শুনল না। অনাড়ম্বর বিয়ে। ছেলের বাড়ী থেকে কয়েকজন মাত্র লোক এসেছে। মা আর দু'চারজন আত্মীয়। মেয়েকে ছেলের পক্ষ থেকে কিছুই দিতে পারে নি। ছেলে কদমবুচি করল রহমতকে। ছেলের মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। "ছেলের মা কইতে উনি, বাপ কইতেও উনি।" বয়স যথেষ্ট। চুলে পাক ধরেছে। তিনি রহমতকে ছালাম করলেন। ছালাম নিতে গিয়ে অর্ধেক উঠে যেন তার হাতটা আটকে গেল। তার স্মৃতির পর্দায় যেন আঘাত করল। "রাবেয়া না?" অস্ফুটভাবে যেন কথাটা বেরিয়ে এল।

—কি রহমত ভাই, আমারে চিনবার পারেন নাই। আমি রাবেয়া। এখন কি আর আমাগো কথা মনে আছে? নিজের সংসার লইয়াই সব ভুইলা আছেন। তা বেয়াইনরে দেখতাছিনা কেন। রাবেয়া যেন পরিবেশ- টাকে হালকা করতে চাইল।

চিনুম না কেন? আগে তো চিনতাম, এখন আবার নতুন কইরা চিনলাম। তা তোমার বিয়ান ভিতরেই আছে।

রহমতের বুকের ভেতর জমানো পাথরটাতে যেন কেউ হাতুড়ি দিয়ে পিটতে শুরু করেছে। সেটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। আর সেগুলো যেন গলে গলে রহমতের দু'চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে।

—:—

কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষিতথ্য কেন্দ্র

ফজলুল হক

পাকিস্তান একটি কৃষি প্রধান দেশ। এর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ লোকই কৃষিজীবী। এতদসত্বেও এদেশের কৃষি পদ্ধতি নানা কারণে এখনো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হতে পারেনি। বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তান পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদীর উর্বর পলি দ্বারা গঠিত হলেও মান্ধাতা আমলের কৃষি পদ্ধতির জন্য এখানকার একর প্রতি উৎপাদন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির অনুপাতে অনেক কম। এদেশের কৃষককে পুরাপুরিভাবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ শিক্ষা দিতে পারলে, কৃষিতে এক নবযুগের সূচনা হবে। কৃষক আবার গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু ও পুকুর ভরা মাছের অধিকারী হবে এবং পূজা-পার্বনে, উৎসবে-আনন্দে সারা দেশে আবার ফিরে আসবে এক অনাবিল আনন্দ ও কর্ম চাঞ্চল্য। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০ জন লোক শিক্ষিত। কৃষকদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত এবং মান্ধাতা আমলের চাষাবাদ পদ্ধতির পক্ষপাতি। এসব কৃষককে আধুনিক চাষাবাদ সম্বন্ধে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদেরই বহন করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো কৃষি সম্প্রসারণ কি?

কৃষকদের মাঝে কৃষি-জ্ঞানের বিকাশ সাধন করে তাদেরকে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার নামই কৃষি সম্প্রাসরণ। কৃষি সম্প্রসারণই কৃষককে কুসংস্কার ও মান্ধাতা আমলের চাষ পদ্ধতি হতে মুক্ত করে আধুনিক চাষাবাদ সম্বন্ধে শিক্ষিত করতে পারে সম্প্রসারণই কৃষককে অনুন্নত জীবন যাত্রা হতে উন্নত মানের জীবন দান করতে পারে। কৃষকের সেকেলে চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে তাকে আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও দৃষ্টি-শক্তি অধিকারি করা এক মাত্র সম্প্রসারণ দ্বারাই সম্ভব।

সম্পসারণ এমন একটি শিক্ষা, যার প্রচলন সাধারণত স্কুল বা কলেজে নেই। ইহা চাষীদের সাথে মিলে মিশে তাদের সমস্যা অনুধাবন ও সমাধানের মাধ্যমে সম্ভব; সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকের গতানুগতিক জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন করে তাকে আব পথে পরিচালিত করা সম্ভব। এক মাত্র সম্প্রসারণ কৃষকের চিন্তা, ভাব ও কর্ম জগতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারে।

সম্প্রসারণ কিভাবে হতে পারে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা ইহাই সম্প্রসারণে প্রথম কথা। সম্পসারণ কর্মী সব জমিনে কৃষকের সা মিলে মিশে কাজ করে তাদেরকে আধুনিক কৃ পদ্ধতি শিক্ষা দিতে পারেন। তাই সম্প্রসারণ কর্মী হতে হবে কৃষি কর্মে সুদক্ষ এবং কৃষি গবেষণার স শেষ তত্ব ও দেশ বিদেশের কৃষিতথ্য সম্বন্ধে ওয়াকে

ধান। এ উদ্দেশ্যে কৃষি বিভাগ মাঝে মাঝে সম্প্রসারণ কর্মীদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে থাকে। সম্প্রসারণ কর্মীকে নিজ নিজ এলাকার সমস্যা ও ইহার সমাধান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকতে হবে। যাতে সম্প্রসারণ কার্য অতি দ্রুত গতিতে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সে জন্য পূর্ব পাকিস্তান কৃষিতথ্য কেন্দ্র নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন করেছে। কৃষিতথ্য কেন্দ্রের সম্প্রসারণ উপকরণকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন (১) সম্প্রসারণ কর্মীর জন্য, (২) কৃষকের জন্য। মডেল, ফ্লিপচার্ট, ফ্লিপ বুক, এক্জিবিশন কিট্স, মালটিপারপাস বোর্ড, রোলেটিং টিচিং বক্স, সিমপ্লি ফাইড টিচিং বক্স, গ্রাফ ইত্যাদির সাহায্যে সম্প্রসারণ কর্মী অতি অল্প সময়ে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত কৃষককে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি শিক্ষা দিতে পারেন।

আবার সম্প্রসারণ কর্মীর স্বক্রীয় সাহায্য ছাড়াও যাতে কৃষকেরা আধুনিক চাষাবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে পারে এ উদ্দেশ্যে কৃষিতথ্য কেন্দ্র কৃষকের উপযোগী করে বেশ কিছু সম্প্রসারণ উপকরণ প্রস্তুত করেছে। এ সকল উপকরণকেও দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা :—(১) শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত কৃষকের জন্য, (২) অশিক্ষিত কৃষকের জন্য। কৃষিতথ্য কেন্দ্র কৃষকের উপযোগী সরল ভাষায় কৃষি বিষয়ক বই-পুস্তক রচনা করে এবং বিনা মূল্যে শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন প্রকার প্যাম্পলেট, লিফলেট, পোষ্টার, কোটেশন বোর্ড, ভিলেজ ইনফরমেশন বোর্ড, ব্যানার, টেকনিক্যাল বোর্ড ও পাবলিসিটি বোর্ড বিতরণ করে কৃষকের এক বিরাট অংশকে শিক্ষা দান করে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ করে থাকে।

গবেষণা করে দেখা গেছে যে মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে ও হস্ত দ্বারা অনুভব করে কোন কাজ যত তাড়াতাড়ি শিখতে পারে বা মনে রাখতে পারে অন্য কোন ভাবে তত তাড়াতাড়ি তা পারে না। তাই নিরক্ষর কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ কার্য যাতে অধিকতর ফলপ্রসূ হয় তজ্জন্য কৃষিতথ্য কেন্দ্র চাষীদের মাঝে কৃষি বিষয়ক সিনেমা শো, কৃষি প্রদর্শনী, নানা প্রকার মডেল, সিনেমা হলে কৃষি বিষয়ক স্লাইড ও রেডিওর মারফতে কৃষি বিষয়ক বক্তৃতা ও আসরের আয়োজন করে নিরক্ষর চাষীদের ভিতর কৃষি সম্প্রসারণের কাজ করে থাকে। এভাবে কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এমনকি নিরক্ষর কৃষককেও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সম্প্রসারণ কর্মী সম্প্রসারণ উপকরণের সাহায্যে কৃষকেরা বুঝতে শিখে তাদের প্রচলিত কর্মে গলদ কোথায় এবং ভাবতে শিখে ইহার সমাধানই বা কি। এভাবে আস্তে আস্তে তারা আধুনিক চাষাবাদ সম্বন্ধে শিক্ষিত হয়ে উঠে, কৃষি সম্প্রসারণের সাফল্য নির্ভর করেছে প্রধানতঃ কৃষকদের উপরই। তারা যত তাড়াতাড়ি নিজেদের সমস্যা ও ইহার সমাধান সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারবে তত তাড়াতাড়ি আমাদের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনারও অগ্রগতি সাধিত হবে।

—: :—

মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু

জাওহার চৌধুরী

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গাছ-বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞদের মতে, বনজঙ্গল এবং গাছপালা থেকে আমরা যে সমস্ত উপকার পাই তার পরিমাণ হবে সাড়ে চার হাজারের চেয়েও বেশী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এই উপকারের পরিমাণ যে আরো বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্বে মানুষের আবির্ভাবের সাথে সাথে সর্ব প্রথমে যে জিনিষটি তাদের অভ্যর্থনা জানায় সেটা বৃক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের মৃত্যুর পর আবার এই গাছপালা একজন অকৃত্রিম বন্ধুর মত তাদের সংগে কবরে বা শ্মশানে গমন করে। যে জিনিষটি আদিম যুগের নিরাশ্রয় মানুষের নিয়মিত আহার যোগাত, লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করত এবং হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ ও অন্যান্য বিপদ-আপদ রক্ষার জন্য নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অস্ত্র হিসাবে তাদের হাতে তুলে দিত সেটাও এই গাছ-পালা ছাড়া কিছু ছিল না। মানুষ সর্ব প্রথম এই গাছ-পালার দ্বারাই তাদের পর্ণ কুটির তৈরী করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বৃক্ষ ছাড়া মানবজীবন অচল।

মানব-সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বৃক্ষের গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলেও এর উৎপাদন ভয়ানকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। জনৈক বিজ্ঞানীর মতে মানব জাতি বনজঙ্গলের ক্ষতি সাধনে সবচেয়ে বেশী অগ্রবর্তী। গাছপালা মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু হলেও তার ভাষাশক্তি নাই, তাই তার মানব বন্ধু যখন তার কোমল গায়ে কুঠার চালায় তখন সে বাধা দিতে পারে না। সে মানুষের এই নির্দয় আচরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোন হৈ চৈ বা কাকুতি মিনতিও করতে জানে না। তাই বলে মানুষ যে তার উপর এই ধরনের অত্যাচার চালিয়ে যাবে তা কোন দিক দিয়েই সঙ্গত নয়। মানুষকে অবশ্যই তাদের নিজেদের স্বার্থেই গাছপালা সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। কেননা তাদের এই অকৃত্রিম বন্ধুটি তাদেরই দয়ামায়ার উপর বেঁচে আছে। একজন বিবেক সম্পন্ন লোক যেমন তার বন্ধুর বুকে ছুরি চালাতে পারে না তেমনি একজন বিবেক সম্পন্ন মানুষ অযথা গাছপালা নষ্ট করতে পারেনা। যে গাছপালার উপর আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে সে গাছপালাকে অযথা নষ্ট করার অর্থই হচ্ছে নিজেদের জীবনকে বিপর্যস্ত করা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আমরা গাছ-পালার উপকারিতা সম্বন্ধে আরো বেশী করে অবহিত

হচ্ছি। বিজ্ঞানীদের মতে গাছপালা কার্বহাইড্রেটের ইঞ্জিন স্বরূপ। গাছপালাই বৃষ্টি ধারা আকাশ থেকে টেনে নিয়ে আসে। যার দ্বারা আমাদের যে আরো কত উপকার করে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

বৃক্ষরোপণ একটি উঁচু ধরনের আর্ট বা শিল্প। গাছ লাগাবার আগে কোথায় এটাকে লাগাতে হবে বা এটার দ্বারা কি উপকার পাওয়া যাবে তা আগে ভাগে চিন্তা করে নেওয়া উচিত। অনেক গাছপালা আছে যে গুলির ছায়া সুশীতল, ফল সুমিষ্ট এবং কাঠ মজবুত। সেগুলি রোপণের জন্য যথাসম্ভব নির্বাচন করা উচিত। গাছপালা শুধু লাগালেই হবে না সেটাকে একজন সম্মানিত অতিথির মত আদর-আপ্যায়ন করে বাড়িয়ে তুলতে হবে। কেন না এই অতিথি যখন তার জীবন সফরের শ্রান্তি কাটিয়ে সুস্থ সবল এবং পাকা পুক্ত হয়ে উঠবে তখন একজন অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় আমাদের স্বার্থে নিজের প্রাণকে বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

আমার বাগানের মালটা

মাহমুদ হোসেন

যে সব মালটা, কিনো ও মোজাম্বি আমরা সচরাচর বাজারে কিনতে পাই তাদের সবগুলিই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসে। পূর্ব পাকিস্তানে মালটার কোন ভালো বাগান নেই বল্‌লেও চলে। বর্ত্তমানে সরকারী প্রচেষ্টায় জৈন্তাপুর (সিলেট) রসাল ফলের গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা জাতীয় উন্নয়ন একাডেমী, অন্যান্য সরকারী কৃষি খামার ও কৃষি উন্নয়ন সংস্থার কৃষি খামারগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানে মালটার সম্ভাব্য ফলন নিয়ে খুব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হচ্ছে। ১৯৬৫ সনের জুন মাসে সিলেটস্থ জৈন্তাপুর রসাল-ফল গবেষণা কেন্দ্র থেকে বেশ কয়েকটি মালটার চারা নিয়ে আমি আমার নিজস্ব মালিকানাধীন গুয়াবাড়ী ফল বাগানে পরীক্ষামূলকভাবে রোপণ করি। এগুলির বয়স বর্ত্তমানে ৪ বছর হতে চললো। গত মৌসুমেই কয়েকটি গাছে বেশ ফল এসেছিলো। আকার, স্বাদ ও গন্ধের দিক দিয়ে এগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের মালটার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। এবার কিনোর চারাগুলি ছাড়া বাকী সবগুলি মালটা ও মোজাম্বির চারাতে কম বেশী ফল ধরেছে। কোনটাতে ফলের সংখ্যা ৭০ টারও বেশী। আমাদের বাগানটি খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে জৈন্তাপুর বাজার থেকে প্রায় ১ মাইল পূর্বে গুয়াবাড়ী মৌজাতে অবস্থিত। এই এলাকার মাটির গঠন প্রণালী হলো, টিলা জমিগুলোতে পাথর ও মোটা বালির অংশ বেশী তাই বৃষ্টির জল সহজেই চুঁইয়ে সরে যায়। আর মাটিতে পাথর থাকায় চারা গাছগুলি মাটি থেকে সহজেই খনিজ পদার্থ যেমন চুন, লোহা, গন্ধক প্রভৃতি পেয়ে থাকে। আমি চারা সংগ্রহের পূর্বে এক লাইন হতে অন্য লাইন ১৬ হাত দূরে রেখে ২×২×২ হাত গর্ত করে তাতে প্রায় ১৫ সের গোবর ও ২ সের ছাই ও কাঠ কয়লা রেখে দেই। তারপর প্রতি বছর বর্ষার পূর্বে ও বর্ষার পরে দুই কিস্তিতে প্রতি গাছের

র দিয়ে মাটি খুঁড়ে তাতে টি, এস, পি ১ সের, ১ পোয়া ও ইউরিয়া ২ ছটাক ও গোবর ৫–১০

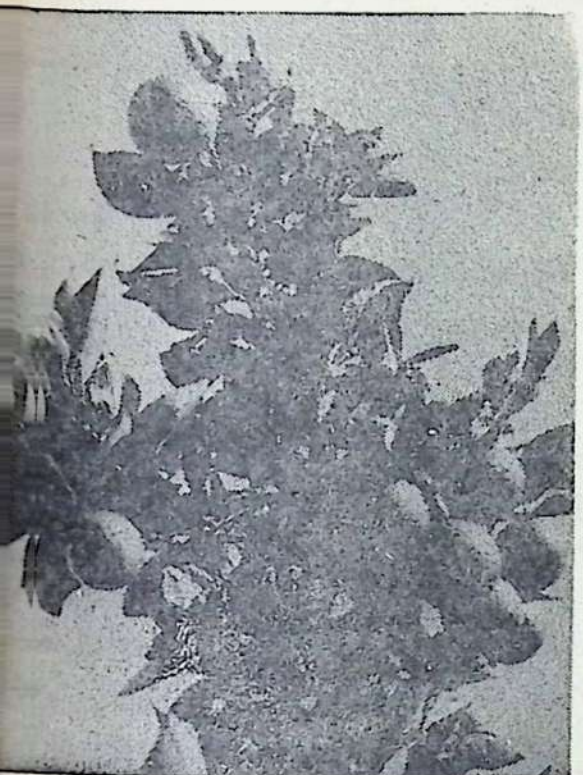

জৈন্তাপুরের খুয়াবাড়ী ফল বাগানের মালট।

সের দিয়ে এসেছি। শীতকালে পানি দেওয়ার সুব্যবস্থা না থাকায় কোন বছর পানি সেচন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। বর্তমানে আমাদের বাগানের পরীক্ষামূলক জমিতে মোট ৬০টি বিভিন্ন জাতের মালটা গাছ রয়েছে তার মধ্যে ৫০টি নিরোগ, সবল এবং ঠিক মত বেড়ে চলেছে।

জৈন্তা বৃষ্টিবহুল এলাকা বিধায় লেবু জাতীয় গাছ–গুলি সব সময়ই ব্যাক্টেরিয়া রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। তাই প্রতি সপ্তাহে আমাকে বর্দো মিকচার স্প্রে করতেই হয়। পোকা-মাকড়ের মধ্যে প্রজাপতির বাচ্চা, যে গুলি গাছের কচি পাতা খেয়ে ফেলে এবং গাছ ছিদ্রকারী পোকা ও গান্ধী পোকা খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায়। তাই আমি প্রতি ১০–১২ দিন অন্তর ডাইমেক্রন বা কারবিক্রন ১০০ ই-সি স্প্রে করি। বর্দো মিকচার বানাতে হয় এবং কারবিক্রণ বা ডাইমেক্রন সরকারী কৃষি অফিস থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মালটা চাষ করলে তা আর্থিক দিক দিয়ে খুবই লাভজনক হবে বলে আমি মনে করি।

কৃষকের স্বাস্থ্য

এ. এম, এম
হাবিবুর রহমান

"স্বাস্থ্যই আসল সম্পদ"—এটা একটা অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রাচীন উক্তি। এটাও অত্যন্ত খাঁটি কথা যে, চেষ্টা করলে পার্থিব সম্পদ সব সময়েই পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাস্থ্য একবার নষ্ট হলে তা উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন ধরুন কোন একটা বছর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি বা অন্য যে কোন কারণেই হোক আপনার জমি উপযুক্ত পরিমাণ ফসল জন্মাল না; এর ফলে আর্থিক অনটনে আপনাকে শেষ পর্যন্ত ধার করতে হল। কিন্তু তার পর বছরই আপনি দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে প্রচুর ফসল ফলিয়ে বিক্রি করলেন, সব ধার পরিশোধ করলেন। আপনার বিপদের মেঘ কেটে গেল।

স্বাস্থ্যের বেলায় কিন্তু এ ধরনের নিয়ম অচল। আপনার স্বাস্থ্য একবার ভেঙ্গে গেলে পরে দ্বিগুণ স্বাস্থ্যের কথা নাই বা বললাম, আসল স্বাস্থ্যটা উদ্ধার করাও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক অসুখের বেলায় স্বাস্থ্য একবার ভেঙ্গে গেলে আপনি আর দ্বিতীয়বার তা ফিরিয়ে পাবেন না। মোট কথা স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে ক্ষেতের ফসলের কথা বাদ দিন আপনার জমিই অনাবাদী থেকে যাবে।

ক্ষেতের কথাই বলুন আর সুখ সমৃদ্ধির কথাই বলুন, মনে রাখবেন সকলের আগে স্বাস্থ্য—এটার অভাব থাকলে আপনি নিজ সমাজে প্রত্যক্ষ না হোক, অনেকটা পরোক্ষভাবে একটি পরিত্যক্ত অবহেলিত জীব। গ্রামের সমাজে বৈঠকে আপনি দিন দিন প্রভাব প্রতিপত্তি হারাবেন। সবাই আপনাকে করুণার চোখে দেখবে। একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝা যায় না। স্বাস্থ্যের বেলায় এ কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অনেকে আছেন বে সুস্থ্য সবল; কিন্তু তারা এটা ভাবেন না যে, স্বাস্থ্য রক্ষা নিয়মাবলী শুধু অসুস্থতার জন্যও নয়, সুস্থতার জন্যও বটে নিরোগ থাকাটা রোগ মুক্তির চেয়ে ভাল। আমাদে দেশের কৃষিজীবিদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কতক গু নিয়মকানুন মোটামুটিভাবে মেনে চলা উচিত। তা হলে যে কোন রোগ তাদের দেহে বাসা বেঁধে মূল্যবা স্বাস্থ্যটাকে ধ্বংস করে দেবে।

গ্রামে দেখা যায়, অনেকেই ভোরে উঠে বাড় পাশের ক্ষেতে বাহ্যিক ক্রিয়া কর্ম সেরে বাড়ীর ধারে পুকুরে সৌচকার্য সমাধা করেন, বালু বা কয়লা দি দাঁত মাজেন, গরু-বাছুর গোহাল থেকে বের ক গোবর নিকান; ঐ নিকানো হাত আবার পুক ধোন। তারপর গত রাতের ভিজান পান্তা-ভাত খে নেন। একই হুকা ছয় সাত জনে মুখ বদল ক হাল নিয়ে মাঠে বেরোন। সমস্ত দুপুর কাঠ ফ রোদে কাজ করতে গিয়ে ভয়ানক পরিশ্রান্ত ও ঘে উঠেন। ঐ অবস্থায় বাড়ী ফিরে পুকুরে গো করতে নামেন বা পেট পুরে ঠাণ্ডা পানি খেয়ে নে কোন দিন দুপুরের খাবার রাতে খান, বিকেলের খা হয়ত খান না, বেশীর ভাগ সময়ই খাবার নিয়ম মে চলেন না বা চলতে পারেন না। তারপর তারা থেকে ফিরে রাতের খাবার খেয়ে নেন। পর ভোরে উঠে খালি পেটে ছিলিম দু'তিন তামাক ে আবার দিনের কাজ শুরু করেন। অথচ স্ব বিজ্ঞানের ধারা অনুসারে উপরোক্ত কার্যাবলী অ অবৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্য হানিকর। ভোরে সূর্য উ আগে বিছানা থেকে ওঠা উচিত। ভোরের ি বায়ু আপনার স্বাস্থ্যের জন্য একটি উত্তেজক টনি বাসি মুখে কিছু খাওয়া বা ধুম পান করা উচিত ভোরে ঘুম ভাঙ্গার পর শুয়ে শুয়ে চিন্তা করা এ বিরাট দোষ ও আলসেমির লক্ষণ। কারো যদি করে ঘুম থেকে ওঠার বদভ্যাস থাকে তবে তার উ

াকে ভোরে বিছানা থেকে ঠেলে তোলার জন্য কে অনুরোধ করা। এর পর পারিবারিক কূয়া নালায় বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম সেরে উত্তমরূপে হাত উচিত। ক্ষেতে খালি পায়ে মল-মূত্র ত্যাগ কতটুকু সর্বনাশকর অনেকেই তা জানেন না। ারা অনেকেই চরম রক্তশূন্যতায় ভোগেন, কিন্তু ন কি পূর্ব পাকিস্তানে রক্তশূন্যতার একটি বড় হুকওয়ার্ম। হুকওয়ার্ম আপনার খালি পায়ের ভেদ করে দেহে আশ্রয় নেয়। দাঁত মাজতে মাড়িতে আঘাত না করে নরমভাবে কচি নিমের দিয়ে দাঁত মাজা ভাল। প্রাতকালীন নামাজ গোহাল থেকে গরু বের করুন। গোবর যেখানে ছেন ওটা কয়েকটা খড় দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। মশা মাছি ঐ গোবরকে আশ্রয় করে বংশ বৃদ্ধি তে পারবে না। অপরিষ্কার হাত ভালভাবে না খাবার জিনিস কিছু খাবে না। সদ্য রাঁধা ভাত-তরকারী খাওয়া আর গত দিনের ঠাণ্ডা ভাত তরকারী গরম করে খাওয়া এক জিনিষ নয়। গরম গরম খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। বাসি যে কোন জিনিষ শুধু খারাপই নয়, অবস্থা বিশেষে স্বাস্থ্যের জন্য বিপদজনকও বটে। খাবার পর ১৫।২০ মিনিট বিশ্রাম করে নেওয়া ছেলে-বুড়ো সকলেরই একটি অবশ্য কর্তব্য। দুপুরে ঘেমে ওঠা শরীরের ঘাম না শুকানো পর্যন্ত পানি পান না করা স্বাস্থ্য ভাল রাখার একটি বড় উপায়। গরম শরীরে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে শুধু যে সর্দিগর্মী লাগতে পারে তাই নয়; একটি ছোট অসুখ থেকে পরে মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে।

সময়কার খাবার সময়মত সেরে ফেলার অভ্যাস না থাকা একটি বিরাট ব্যাধির দিকে আপনাকে টেনে নিয়ে যায়। জানেন কি "পেপটিক আলসার" বা পেটের শূল বেদনার একটি বড় কারণ খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে নিয়ম মেনে না চলা। রাতে গড়পড়তা ৭।৮ ঘন্টা একটি মধ্য বয়স্ক লোকের ঘুমানো উচিত।

হযরত জাবির হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম (দঃ) বলেছেনঃ (এক সঙ্গে বসে খেলে) একজনের খাবার দু'জনের জন্য—দু'জনের খাবার চারজনের জন্য—আর চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।

—আবু ইয়ালা

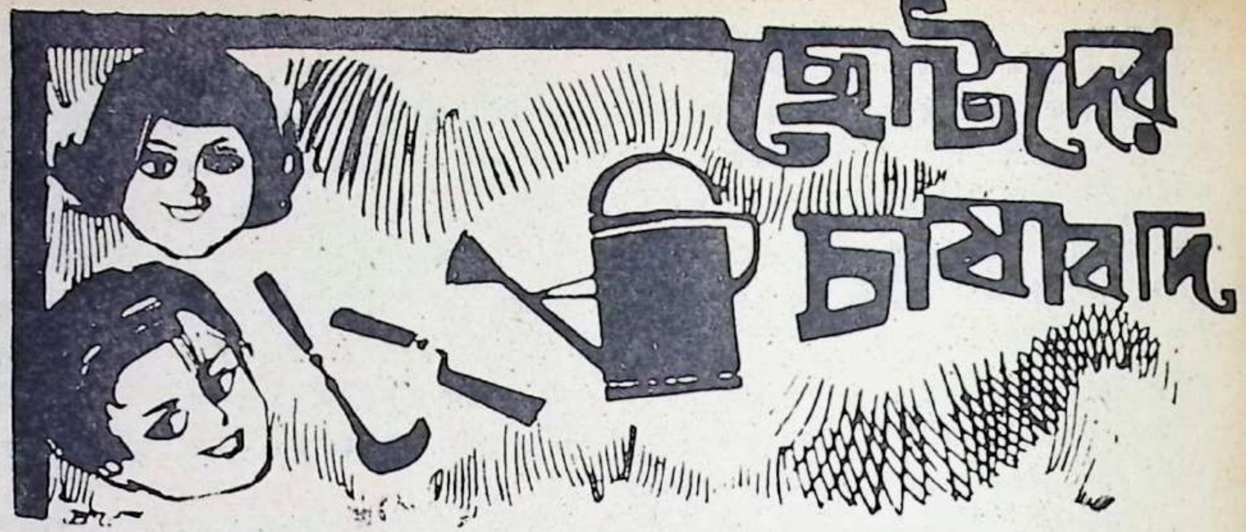

পরিবর্তন

—সুলতানা নাজনীন আরা

শেষ পর্যন্ত ভাইয়ারও যে ভুল ভাংবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ধীরে ধীরে আমার মানসপটে ভেসে উঠল কয়েক দিনের আগেকার সেই দৃশ্যটি।

আম্মা, আম্মা, আমি তোমার মেয়ের মোরগের পা-ডানা একটা কিছু যদি ভেঙ্গে দেই তাহলে তোমার আদরের দুলালি যেন মায়াকান্না না করেন, বুঝলে?'' ভাইয়া চিৎকার করে কথাগুলি উচচারণ করলেন।

—কেন? তাম্মুর মোরগের আবার কি দোষ?

—তুমি শুধু আমার মোরগের কিছু করে দেখ তার আগে যদি তোমার হাত ভেঙ্গে না দেই তবে আমার নাম তাম্মু নয়। আম্মার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি বলে উঠি।

—মারবো, একবার নয়, একশ' বার মারবো। আর একটিবার শুধু আমার বাগানে ঢুকে গাছ নষ্ট করে দেখুক না। দেখবে মজা তোমার মোরগ বাছাধনেরা। একটা দুটা নয়, যেন এক ঝাক।

যখন রোজ সকালে উঠে আমার মুরগীর ডিম খাও তখন বুঝি কিছু মনে থাকেনা, না? আর যখন রকিব, নাসিম, সেলিম, অনটু আসে তখন তো ঐ মুখ দিয়ে বাহির হয়, ''দে, আপু, দুটো ডিমের মামলেট করে ইত্যাদি ইত্যাদি।'' মুখ ভেংচে বল্লাম আমি।

—যাও, তোমার মুরগীর ডিম আমি আর কে
দিন খাবনা। গোশতও ছু'ব না। সত্যি, সত্যি, সতি
তিন সত্যি করে বলছি আরও বলছি যদি, অ
কোনদিন তোমার মোরগ আমার বাগানে ঢুকে ত
আমি তাদের পা ভেঙ্গে দেব কিন্তু। রাগে অভিমা
বলে উঠলেন ভাইয়া।

আমি জানতাম ভাইয়া খুবই জেদী। একটা
একটা কিছু করবেই। তাই আম্মাকে বলে ঐ দি
কিছু জালি কিনে মোরগের বাসস্থান তৈরী ক
নিলাম। ভাইয়া তখন আমাকে ক্ষেপাবার জ
আম্মাকে সম্বোধন করে বল্লেন, আম্মা, বাড়ীটা
চিড়িয়াখানা যে, এখানে মোরগ পোশা হবে, প
পোশা হবে।

বলা বাহুল্য, আমার একটি তোতা পাখীও ছিল
ভাইয়ার নাম ছাড়া আর সবই বলতে পারত। (ভাই
নামটা একটু বড় ছিল কি না) এইজন্য তা
তোতাকে নিজের বলে বাহাদুরী ফলাতে পারতো
বলে ওর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছিল বেচারী তো
উপর।

ভাইয়ার এইসব উপহাস আমি নীরবে হজম ক
নিতাম। কয়েকদিন পরের কথা। বিকালে ঘ
উঠছি। হঠাৎ দেখি ভাইয়া কাকে সঙ্গে করে ড
রুমে ঢুকলেন। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এ

তিনি হন্তদন্ত হয়ে কাকে যেন খুঁজছেন। আমাকে সামনে দেখে বললেন, তাম্মু, আম্মা কই? আমি আম্মাকে ডেকে দিলাম। তখন ভাইয়া আম্মাকে বললেন, আম্মা, ভাবীর বাড়ী থেকে এসে তোমাকে যার কথা বলছিলাম সেই হারুন আজকে ট্রেনে এসেছে, আমি বাইরে যাওয়ার সময় দেখি আমাদের বাড়ী খুঁজছে। আমি নিয়ে এলাম। ওদের বাড়ী আমাকে কি আদর আপ্যায়ন করেছে। এখন আমার বাড়ীতে এসেছে আমার উচিত কিছু করা। রাতের খাবার যে এখানেই খাবে। কিন্তু এখন বাজারে ভাল মোরগ, মাছ, মাংস কিছুই পাবনা। ঘরে কিছু আছে নাকি? "আম্মা বললেন," একমাত্র আলু ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই।

ভাইয়া তখন করুন স্বরে বললেন, এখন তাহলে কি করা যায় আম্মা?

আম্মার মুখও চিন্তাক্লিষ্ট কপালে কুঞ্চিত রেখা দেখা দিয়েছে।

ভাইয়া হঠাৎ খুশীতে লাফ দিয়ে বলে উঠলেন, "আম্মা পেয়েছি। তাম্মু, তাম্মু এদিকে এসো"। আমি কি ভুলই না করেছিলাম বোন, কিন্তু তুই এবার আমাকে বাঁচা। আমি ভাইয়ার কথা শুনে কিছু বুঝতে না পেরে 'থ' বনে গেলাম। কিং ভাংগিয়ে বলনা?

—তোর দু'টো ডিম আর একটা মোরগ দে'না। ভাইয়া অনুনয়ের স্বরে বললেন।

—কেন? তুমি না সেদিন বলেছিলে যে, আমার মোরগে তোমাদের কাজে কোন প্রয়োজন নেই, আর আমি বাড়ীর মধ্যে চিড়িয়াখানা বানিয়েছি............ ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে আজকে কেন আমার এই পচা মোরগের প্রয়োজন হয়েছে? না আমি দেব না।

—দে বোন, আমি আর তোর মোরগকে মারবো না, তোকে ক্ষেপাবো না এবং ফার্মের মোরগ এনে তোকে দিব পোষার জন্য। এতদিন আমি চোখ থেকেও অন্ধ ছিলাম। সত্যি আমি বুঝতে পারিনি এই ক্ষুদ্র প্রাণী যে আমাদের কত উপকার করে। এখনই ঐ তারের বেড়া উঠিয়ে ফেল।

—থাক, থাক আর বলতে হবেনা। তোমার যে এতদিনে চোখ খুলেছে এতেই আমার আনন্দ। এখন বল কি দিয়ে কি রান্না করবে?

—আমি কি জানি তোরা যা ভাল বুঝিস তাই কর।

রাতে খাবার টেবিলে বসে সবাই খাচ্ছে তখন ভাইয়া হারুন ভাইসহ প্রবেশ করলেন। আম্মাকে বললেন; এই যে আম্মা, ভাবীর ভাই হারুন। এবার শেষ বর্ষ মেডিকেলের ছাত্র। আর বুঝলে হারুন, এই আমার আম্মা। হারুন ভাই হাত তুলে সালাম জানালেন। আমার দিকে তাকিয়ে ভাইয়া বললেন, হারুনের পরিচয় তো তুমি আগেই পেয়েছ।

—হাঁ হাঁ যার প্রশংসায় তুমি সদা পঞ্চমুখ, বললাম আমি।

—আর এই হল আমার অনুজা। আম্মার আদরের দুলালী এবং রীতিমত একটা চিড়িখানার মালিক। মানে বুঝলে তুমিই ওর চিড়িখানার একটি প্রাণীর সদ্ব্যবহার করতে যাচ্ছ।

সবাই তখন হো হো করে হেসে উঠল। হারুন ভাইয়া বলে উঠল, চিনেছি আর চিনতে হবে না। এর পর সবাই খেতে শুরু করলাম।

কয়েকদিন পর দেখি ভাইয়ারও মোরগ পোষার সখ ধরেছে। এরি মধ্যে কয়েক জোড়া ফার্মের মোরগও কিনে দিয়েছেন আমাকে। এখন আমি বেশ বড় এক ঝাক মোরগের মালিক।

"প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের চিন্তাই বর্তমান চিন্তার খাদ্য।"

—কাশ্‌ত্‌কার

ভিন দেশের কৃষি

—আলফাল্লাহ

জর্দান

ভৌগলিক দিক দিয়ে জর্দান সিরিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃতপক্ষে সিরিয়া, লেবানন, ফেলিস্তিন এবং জর্দানের ভূপ্রকৃতি এক এবং অভিন্ন। এ অঞ্চল থেকেই বিশ্বের বড় বড় ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এখানেই অসংখ্য নবীরসূল জন্মলাভ করেছেন। পুরাতত্ববীদদের মতে, জর্দান মনুষ্য বসতির প্রাচীনতম ভূখণ্ড। আজ থেকে প্রায় আট হাজার বছর পূর্বে জর্দানের আরিহা শহর গড়ে উঠে। খৃষ্টজন্মের পাঁচ শ' বছর পূর্বেও এ অঞ্চলের লোক তামার ব্যবহার জানত। জর্দান নদীর পূর্বাঞ্চলের উর্বর ভূখণ্ড বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতিকে প্রলোভিত করেছে। ফলে তারা দেশ ত্যাগ করে জর্দানকেই নিজেদের মাতৃভূমি করে নিয়েছে।

জর্দানের উত্তরে সিরিয়া, পূর্ব-উত্তরে ইরাক, দক্ষিণে সউদী আরব এবং পশ্চিমে ইঙ্গমার্কিন চক্রান্তে প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল রাষ্ট্র। ইহার সর্বমোট আয়তন ৪৮ হাজার বর্গ মাইল। দেশের মোট ভূমির প্রায় ৪/৫ অংশ মরু অথবা পাথুরে পাহাড়িয়া অঞ্চল। ১৭ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৮৮ ভাগ মুসলমান, ১০ ভাগ খৃষ্টান এবং ২ ভাগ অন্যান্য জাতি।

জর্দানে সাধারণতঃ শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ এবং বসন্ত এই চারটি ঋতু দেখা যায়। গ্রীষ্মে গরম পড়ে খুব বেশী; শীত ঋতু অনেকটা স্বাভাবিক এবং সহনীয়। গ্রীষ্মের তাপমাত্রা ৮০° ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং শীতে ৫০° ডিগ্রী ফারেনহাইটের মত থাকে। শীত ঋতুতেই বৃষ্টিপাত হয় বেশী। জর্দান নদী একটি সুন্দর উপত্যকা দিয়ে বয়ে গেছে এবং দেশের কৃষিকাজের জন্য সর্বদা পানি সরবরাহ করছে। দেশের সমতল এবং পাহাড়িয়া এলাকা সমান উর্বর। পাহাড়িয়া এলাকায় অসংখ্য ফলের বাগান এবং পশুচারণভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। সমতল ভূমিতে গম, যব এবং অন্যান্য তরিতরকারী জন্মে। জর্দানের উত্তরাঞ্চল অপেক্ষাকৃত বেশী সুন্দর এবং উর্বর। সেখানে কয়েকটি বেদূইন সম্প্রদায় সাময়িকভাবে এক একটি জায়গায় চাষাবাদ করে, আবার সুযোগ বুঝে একদিন অন্য জায়গায় চলে যায়। পাহাড়িয়া এলাকায় অক্টোবর এবং মে মাসে আনুমানিক ২০ ইঞ্চি এবং সমতল এলাকায় আনুমানিক ৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। দেশের মোট ভূমির মাত্র ১/৬ অংশ চাষাবাদের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায় দিন দিন আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিম্নের পরিসংখ্যাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কিসের চাষ করা হয়েছিল।	কি পরিমাণ জমিতে চাষ করা হয়েছিল। (একরের হিসাবে)	
	১৯৫৪ ইং	১৯৬৩ ইং
(১) খাদ্যশস্য	২২ লক্ষ	৩০ লক্ষ
(২) পশুখাদ্য	১৮ লক্ষ ৩০ হাজার	২৫ লক্ষ
(৩) গাছপালা	২৫ হাজার	৭০ হাজার

১৯৬৪ সালে জর্দানে দেড় লক্ষ টন গম এবং এক লক্ষ টন যব উৎপাদিত হয়েছে। বর্তমানে পানি সেচের নতুন নতুন পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে। অবশ্য এগুলি পুরাপুরি কার্যকরী হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। দেশে প্রচুর পরিমাণে ফলবৃক্ষ ও তৈলবীজের চাষ করা হয়। জর্দান আংগুরের জন্যও বিখ্যাত। জয়তুনের চাষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। জদানে ৪ হাজার উট সমেত প্রায় ১ লক্ষ গৃহপালিত পশু আছে। সেখানে সাধারণতঃ ভেড়া-বকরি পালন করা হয়। কেননা পাহাড়িয়া এলাকায় এদের প্রচুর চারণভূমি রয়েছে।

১৯৪৯ সালের পূর্বে জর্দানের লোকসংখ্যা ছিল কম এবং উৎপাদন ছিল বেশী। তাই সেখানকার গম, যব, ভেড়া বকরী, পশম, সব্জী এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু বিদেশে রফতানী করা হত। কিন্তু ফেলিস্তিন থেকে মুহাজিররা দলে দলে আগমন করার ফলে সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। আজ সেখানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার মত কোন উল্লেখযোগ্য জিনিষ নেই। এ অবস্থার যাতে উন্নতি হয় সেজন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে অবিরাম চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

—:—

"এবং পৃথিবীতে রহিয়াছে বিভিন্ন প্রকার ভূমি পাশাপাশি এবং আংগুরের বাগান, কৃষিক্ষেত্র এবং খেজুরের গাছ, যাহার কতকগুলি একমূলী, কতকগুলি অন্যরূপ, সেগুলিকে সিক্ত করা হয় একই পানি দ্বারা অথচ আমি কতকগুলিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেই অপরগুলির উপর। বস্তুতঃ উহাতে বহু নিদর্শন রহিয়াছে বুদ্ধিমান লোকের জন্য।"

—সূরা আর-রহমান, ১ম রুকু

কৃষি জগতের টুকিটাকি

—আউয়াল আহমেদ

মানুষেরাও পোকা খায়

শুধু পাখী, সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি এবং মাছই নয়, মানুষেরাও অনেক পোকা-মাকড় খেয়ে থাকে। চীনারা আরশুলার চাট্নী খায়, আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানরা গোবরে পোকার তরকারী দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করে, পাক-ভারত উপমহাদেশের অনেক উপজাতিদেরও নাকি প্রধান খাদ্য পোকা-মাকড়। বিশ্ব পর্যটকদের মতে এখনও মানবসভ্যতার আলোক যেখানে গিয়ে পেঁছায়নি সেখানকার অধিবাসিরাও পোকা-মাকড় খেতে অভ্যস্ত। শুধু তাই নয়, সভ্য মানুষের মধ্যেও পোকা-মাকড় খাওয়ার প্রচলন আছে। যেমন, কতিপয় বড় রকমের জলচর পোকার ডিম মেক্সিকো শহরের বাজারে নিয়মিত বিক্রি হয়ে থাকে। ডিমগুলোর আকৃতি কতকটা বন্দুকের গুলির ছর্‌রার মত। মেক্সিকানরা পানির নীচে মাদুর বিছিয়ে রাখে। সেখানে লক্ষ লক্ষ কীট-পতঙ্গ ডিম পাড়ে এবং এই ডিম সংগ্রহ করে ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে বস্তাবন্দী করে বাজারে বিক্রি করা হয়। এগুলো সেদেশের লোকেরা কিনে নিয়ে উপাদেয় 'পিঠা' তৈরী করে খায়। মেক্সিকোর অধিবাসীরা 'গুসানোস ডি মেগুয়ে' নামক পোকার কীড়া দিয়েও সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করে বাড়ীতে অতিথি মেহমানদের আপ্যায়ন করে থাকে। এই পোকা তাজা অবস্থায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এগুলো ভাল করে তেলে ভেজে খাদ্য তৈরী করা হয়। 'করিক্‌জা ফেমোরেটা (Corixa femorata) নামক পোকার ডিমও চর্বিতে ভেজে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করা হয়।

সম্মানিত অতিথির সামনে খাবার টেবিলে এক প্লেট ঝিঁ ঝিঁ পোকা' দিতে পারলে জামাইকার লোকেরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিরা 'এগ্রোটিস ইনফিউছা' (Agrotis infusa) নামক মথ, থলেতে সংগ্রহ করে ও পরিশেষে কয়লার আগুনে ঝল্‌সিয়ে নিয়ে এক রকমের উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এই খাদ্যের স্বাদ নাকি বাদামের মতো এবং এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ তৈল। তুরস্ক, ইরাক ও ইরানের কৃষিজিবীরা জাব পোকার মধু মিষ্টান্ন স্বরূপ ব্যবহার করে থাকে। বোডেনহিমার এবং সোয়ারস্‌কির মতে এই খাবার কেবলমাত্র ইরাকে বাৎসরিক প্রায় ৭০,০০০ পাউণ্ড বিক্রি হয়। জেরু-জালেমের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে খোসা পোকা জাতীয় 'কক্কাস মেনিফেরা' (Coccus mannifera) নামক পোকার নির্যাস দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে খাওয়ার রেওয়াজ ছিল।

কুভিয়ারের 'Natural History' পড়ে 'যাযাবর পঙ্গপাল' সম্পর্কে অনেক চমকপ্রদ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আরব দেশে ও প্রাচ্যের অনেক স্থানে,

শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে সেখানকার লোকেরা পঙ্গপাল ধরে ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে চূর্ণ করে রুটি তৈরী করে খায়। বাগদাদে খোলাবাজারে বিক্রির জন্য দোকানীরা পঙ্গপাল আমদানী করে, ফলে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দাম নাকি অনেকাংশে কমে যায়। রিপোর্টে আরও জানা যায় যে, এই পঙ্গপালের মধ্যে পায়রার গন্ধ রয়েছে। পঙ্গপালের রন্ধন প্রণালীও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের। মিশরের বেদুইনেরা কয়লার আগুনে এদের জীবন্ত দগ্ধ করে পরম তৃপ্তির সাথে আহার করে। তবে আগুনে দেওয়ার আগে এদের গা থেকে পাখা ও পা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। অনেক স্থানে আবার নাড়িভুঁড়িও পৃথক করে ফেলে দেওয়া হয়। মরক্কোর অধিবাসীরা এই পোকা বাড়ীর ছাদে শুকিয়ে আগুনে ঝল্‌সিয়ে খায়। বারবেরির লোকেরা পঙ্গপাল দিয়ে আচার বানিয়ে রাখে ও সময় সময় তৃপ্তি সহকারে খেয়ে থাকে।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই পঙ্গপাল খাওয়ার রীতি আছে। রাজস্থানের উপজাতীয়রা পঙ্গপাল ধরে আগুনে ঝল্‌সিয়ে খায়। সেখানে খোলা বাজারে এই পোকা চোরদরে বিক্রি হয়। কোলকাতা শহরেও নাকি অনেকেই শুকনো পঙ্গপাল তরকারীতে ব্যবহার করে থাকে।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা পিঁপড়া, উইপোকা গুঁড় পোকার কীড়া, অন্যান্য পোকার কীড়া ও ফরিং ধরে খায়। প্রাচ্য দেশের কোন কোন অঞ্চলে খাদ্য হিসাবে ফড়িংএর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। পঙ্গপাল ও ফড়িং খাওয়ার উল্লেখ বাইবেলে আছে এবং অদ্যাবধি কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ফড়িংএর চাহিদা রয়েছে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমানদের ঝিঁ ঝিঁ পোকার সাথে পঙ্গপাল খেত বলে ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়। আরবের লোকেরা এই পোকা মাখনে ভেজে নিয়ে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে প্রীতিভোজের আয়োজন করত।

আমাজান উপত্যকার আদিম অধিবাসী, 'আট্‌টা সেফালোটিস' (Atta cephalotes) নামক পিঁপড়া খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। বড় বড় পাখাওয়ালা পিঁপড়া দিয়ে কোন আদিম অধিবাসীকে প্রাতঃরাশ (Breakfast) করতে দেখলে কোন বিদেশী আগন্তুকের কাছে হয়ত বিস্ময়কর বলে মনে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশের অধিবাসীরা 'এফিড্রা হিয়ান্‌স্‌ (Ephydra hians) নামক মাছির পুত্তলি খেতে পছন্দ করে। ভারতীয়দের কাছে এই পোকা 'কু-সাব' (Koo-tsabe) নামে পরিচিত ছিল। গ্রীস দেশীয় লোকেরা পতঙ্গ শুকিয়ে লোহার পাত্রে চূর্ণ করে ময়দা বানিয়ে এক-প্রকার রুটি তৈরী করে খেতো। নিউগিনির উপ-জাতীয়রা কেড়ী পোকার কীড়া তাদের খাদ্য তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। ফিলিপ্পিয় মতে পেরুতে এলমিস (Elmis) নামীয় পোকা সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়। বার্মিজরা গুটি পোকার কোকুন ও পুত্তলি খেতে ভালবাসে। বার্মাতে ইরেটিস এসটিকটিকাস (Eretes sticticus) নামক এক প্রকার জলচর পোকার কীড়া সংগ্রহ করে খাওয়া হয়। খাদ্যের ব্যাপারে প্রতিদিনের একঘেয়েমীকে দূর করার জন্য বার্মাতে 'ইকোফাইলা এসমারাগডিনা' (Oecophylla smaragdina) নামক লাল পিঁপড়া খাওয়া হয়।

ভারতের কোন কোন আদিম অধিবাসীরা পিঁপড়া, ফরিং, মৌমাছির কীড়া ও পুত্তলি, মথ, মাছি ও কাঠ-ছেদনকারী পোকা ধরে কাঁচা অবস্থায়ই খেয়ে ফেলে। অনেকে আবার রোদে শুকিয়ে নিয়ে অথবা আগুনে ঝল্‌সিয়ে নিয়ে খেতে ভালবাসে। কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা বুনো মৌমাছির কীড়া ও পুত্তলী আহার করে। তরকারী সুস্বাদু ও সুগন্ধময় করার জন্য অনেকে কোন কোন পিঁপড়া ব্যবহার করে থাকে। আসামে ভাতের সাথে এসপনগোপাস (Aspongopus) নামক বড় বড় গান্ধীপোকা খাওয়া হয়।

আফ্রিকার মতো ভারতের কোন কোন স্থানে উঁই পোকার রাণী ধরে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ১২।১৪ বৎসরের উঁইয়ের রাণী খেতে দেওয়া হয়। খাওয়ার পরে পরেই ছেলেরা দুই বা ততোধিক মাইল দৌড়িয়ে থাকে।

এ রকম করলে নাকি সে ভাল দৌড়াতে পারে এবং দৌড়জনিত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। ভারতের অরণ্যাঞ্চলে 'এপিস ডরসেটা' (Apis dorsata) নামক জংলা মৌমাছির কীড়া ও পুত্তলি উপজাতীয়েরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। সিল্ক সরিয়ে নেয়ার পর কোকুনের ভেতরের কিড়াও সুস্বাদু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলার উপ-জাতি সাঁওতালেরা লালপিঁপড়া খেতে ভালবাসে। চারুলাল মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য থেকে জানা যায়: 'O, they will eat anything that flies except aeroplanes and anything that swims except boats'। যাহোক, অনুরূপ রীতি পৃথিবীর অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যেও রয়েছে। সাঁওতালদের মতো মুরিয়া ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অধিবাসীর মধ্যে পিঁপড়া খুব পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। তামিল প্রবাদ আছে: 'তুমি যদি এক হাজার পিঁপড়া খাও, তবে একটি হাতির শক্তি লাভ করবে।' আমাদের গ্রামাঞ্চলেও শুনতে পাওয়া যায়: পিঁপড়া খেলে সাঁতার শেখা যায়।'

সতীশচন্দ্র ঘোষ উল্লেখ করেছেন যে, নিম্নশ্রেণীর চাক্‌মারাও পিঁপড়া জাতীয় কীট-পতঙ্গ খায়। সাদা পিঁপড়া (চেরাই পোগ) ভাজা নাকি তাদের কাছে খুব সুস্বাদু।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে পড়ে সম্ভবত: আগামী দিনের অর্থবীদেরা মানুষের খাদ্য হিসেবে কীট-পতঙ্গের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তার প্রয়াস পাবেন।

—:—

"শিশুদের হাতে গাছের চারা লাগানো একটি খুশীর কাজ। শিশুর কচি হাতের পবিত্র পরশে যে গাছের জন্ম হলো, সেই গাছই হয়তো পঞ্চাশ বৎসর পরে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের মধুর পরিবেশের কথা। বৃদ্ধ পিতা-মাতার হাত দিয়ে ফলের গাছ লাগিয়ে রাখা সন্তানের লাভ। ফটোগ্রাফ মলিন হয়ে যায়, কিন্তু স্মৃতির ভার নিয়ে গাছ দাঁড়িয়ে থাকে বহুকাল।"

—হামিদ উদ্দীন আহমদ

প্রশ্নোত্তর

উত্তরদাতা—এম, আবদ্দুল লতিফ

১। নাজির উদ্দিন মিয়া চৌধুরী,
গ্রাম—খামার রামদেবপুর,
পো:—চাপরী, জেলা—বরিশাল।

প্রশ্ন: আমি কৃষি কাজ করতে ইচ্ছুক। দয়া করে কৃষি সম্বন্ধীয় কিছু বই পাঠিয়ে দিবেন। আমি সুপারী, নারিকেল ও অন্যান্য ফলাদি ও গৃহ পালিত হাঁস-মুরগী, উন্নত জাতের পাখী ও উন্নত জাতের গরু-বাছুর পালন ও রোগ দমন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারলে সুখী হতাম। ইরি ধান করার জন্য কি ভাবে একটি পাওয়ার পাম্প পেতে পারি জানাবেন। একা একজনে ৪০ একর পর্যন্ত ইরি ধান করতে পারে কি না জানাবেন।

উত্তর: আপনার জন্য কৃষি ও উন্নত জাতের পশু পাখী পালন সম্বন্ধে বিনা মূল্যের পুস্তিকা পাঠান হ'লো। আপনি যদি পাওয়ার পাম্প ঋণের টাকা নিয়ে ক্রয় করতে চান তবে আপনাকে মহকুমার কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সাথে আলোচনা করে ব্যাঙ্কের নির্দ্ধারিত ফরমে দরখাস্ত করতে হবে।

আপনার যদি ইরিধান করার মত ৪০ একর কিংবা বেশী জমি থাকে ও সেচের সুবন্দোবস্ত থাকে তবে নিশ্চয়ই আপনি একাই (কোন অনুমোদন ব্যতীত) ইরি ধানের চাষ করতে পারেন।

২। এম, এম, আলী,
গ্রাম—টাটাকপুর, পো:—বিরামপুর,
জেলা—দিনাজপুর।

প্রশ্ন: আমার একটি নারিকেল গাছ আছে। বয়স বার বৎসর। গাছে নারিকেল ধরে প্রচুর কিন্তু ছটাক পরিমাণ হতেই ঝরে পড়ে। গাছের গোড়ায় যে সার প্রয়োগ করবো সে উপায়ও নাই। কারণ গাছের চার পাশে থাকার ঘর রয়েছে। যদি গাছের উপরে কোন ঔষধ ব্যবহার করা যায় তাহলে কৃষিকথার মারফত জানাবেন।

উত্তর: গাছের পাতার সার প্রয়োগের ব্যবস্থা এদেশে নাই। মাটিতেই আপনাকে সার প্রয়োগ করতে হবে। আপনার গাছটিতে প্রতি বছর নিম্নলিখিত সার প্রয়োগ করলে আশাকরি ভাল ফলন পাবেন। পচা গোবর সার ২ হতে ২½ মণ, ট্রিপল সুপার ফস্-ফেট ১½ সের, সরিষার খৈল ৩ সের, মিউরেট অব পটাশ ১½ সের। গোবর সার পাওয়া না গেলে গাছ প্রতি ১½ সের ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে পারেন।

উপরোক্ত সারগুলো এক সঙ্গে মিশিয়ে গাছের চারি দিকে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগ করে মাটি কুপিয়ে দিতে হবে, যাতে করে সারগুলি মাটির নিচে ঢাকা পড়ে।

৩। নারায়ণ চন্দ্র বণিক,
গ্রাম ও পো:—নকলাবাজার,
জেলা—ময়মনসিংহ।

প্রশ্ন: ১। আমি গোলাপ ফুলের অনেক ডাল লাগাইয়াছি। অনেক ডাল হইতে অংকুরও বাহির হইয়া ২।৪ টা পাতা গজাইয়াছে।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সেগুলি হলুদ রং ধারণ করিয়া মরিয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিকার কি? ইহা কি ভাবে লাগাইতে হয়? ইহা কি রকম মাটির দরকার? ইহা লাগানোর জন্য কি কি সার প্রয়োগ করা হয় তাহা জানাইবেন।

২। পাতাবাহার জাতীয় গাছের ডাল কাটিয়া তাহার গোড়ার দিক পানি ভর্তি বোতলের ভিতরে কিছুদিন রাখিয়া দিলে ঐ ডালের শিকর গজাইয়া যায় কিন্তু গোলাপ, গন্ধরাজ ও বেলী গাছের বেলায় তাহা হয় না কেন? বাগান সম্বন্ধে কোন বই থাকিলে পাঠাইয়া দিবেন।

উত্তর: গোলাপ গাছের শাখা কলম করার ব্যাপারে গলদ রয়েছে তাই কলমগুলি টিকছে না, আপনি নিম্নলিখিত নিয়মে শাখা কলম করবেন।

উত্তর: বসন্তের শেষ হতে বর্ষা পর্যন্ত শাখা কলম করার উপযুক্ত সময়। শাখা কলম করার জন্য কিছু ছায়া পড়ে এমন স্থানে দো-আঁশ মাটি বেছে নিতে হবে। এই মাটিতে প্রায় আধহাত গভীর করে খনন করতে হবে এবং উহার সহিত কিছু পচা গোবর সার, বালি উত্তমরূপে মিশাইলে শাখা কলম পুতিবার উপযুক্ত হয়। এক বছর বয়স্ক শাখা হইতে ৬—৯ ইন্‌চি দীর্ঘ খণ্ড নিয়ে সেগুলি কাত করে মাটির সাথে প্রায় ৪৫° কোণ করে পুতিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন খণ্ডের গোড়ার দিকের প্রায় অর্ধেক অংশ মাটির নিচে থাকে।

সকল গাছের বংশ বিস্তারের প্রণালী একরূপ নয়। কোন কোন গাছ সম্পূর্ণ পানি-তেই জন্মে বা বংশ বিস্তার করতে পারে কিন্তু অনেক গাছই শুধু মাত্র পানিতে বাঁচতে পারে না বা শিকড় দেয় না। ফুলের বাগান সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য আপনি কামাল উদ্দিন আহম্মদ সাহেবের ফুল, ফল ও শাক-সব্জী নামক পুস্তকখানি ক্রয় করতে পারেন। দাম ৭ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—

সর্বজনীন গ্রন্থনালয়
১৪০, গভর্ণমেন্ট নিউ মার্কেট, ঢাকা—২

অথবা

কৃষিতথ্য কেন্দ্র, ৩, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা—৩।

"গ্রামোন্নয়নের জন্য সমস্ত পরিস্থিতির প্রাণকেন্দ্রে যা বিরাজ করছে তা হচ্ছে চাষী নিজে। বস্তুতঃ আরো শিক্ষিত, আরো আলোকপ্রাপ্ত এবং আরো পরিশ্রমশীল চাষীর চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয় আমাদের আর কিছুই নেই।"

—এইচ, এস, এম, ইসহাক

পুস্তক পরিচয়

—দেওয়ান আবদুল হামিদ

শপথ (সাহিত্য সংকলন) : সম্পাদনায় মোঃ আছাদুল ...ী, প্রকাশনায় : পুর্ব পাকিস্তান কৃষি মহা বিদ্যালয় ...ত্র সংসদ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০।

...বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র সংস্থা, সাহিত্য ...সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের তরফ হতে অহরহই কোন ...কোন সংকলন বের হচেছ। নানান উপলক্ষে এক ...টি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো প্রকাশিত ও ...চারিত হয়ে থাকে। আলোচ্য সংকলনটিও ঐ জাতীয়। ...ধীনতা স্মারক হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

'শপথে' সর্বমোট ২২টি লেখা স্থান পেয়েছে। ...মধ্যে ১টি ইংরেজীতে ও অন্য সব কয়টি বাংলায়। ...কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এস, এ, খানের শুভেচ্ছা-...বাণী নিয়ে শপথের যাত্রা শুরু হয়েছে। তাঁর বাণীটি ...আন্তরিকতায় ও বলিষ্ঠ অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। এতে ...তরুণ মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার এক নব প্রেরণা সঞ্চারিত হবে বলেই আমাদের ধারনা। সহঃ সভাপতি ও সম্পাদকের কথার পর বিশিষ্ট কৃষি সাহিত্যের লেখক জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলীর সম্পাদককে লিখিত ১টি চিঠি রয়েছে। এতেও ছাত্রদের প্রতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার বাণী রয়েছে।

শপথে যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে একটি জাতীয় আদর্শের অনুপ্রেরণা, দেশকে ভালবাসার বজ্র শপথের অনুরনন শোনা যায়। আছাদুল বাকীর 'কায়েদে আজমের দৃষ্টিতে পাকিস্তান' (প্রবন্ধ), মোঃ ইব্রাহিমের 'আজাদী দিনে' (গল্প) মোঃ জয়নুল আবেদীনের 'আমরা কিশোর হাটবো' (কবিতা) প্রভৃতিই তাই একই দৃষ্টি কোণ থেকে উৎসারিত। জনাব কলিমউদ্দিন আহমদের 'আমাদের কলেজ' প্রবন্ধটিতে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ছাত্রদের কোন কোন লেখায় কাঁচা হাতের স্পর্শ থাকলেও তাঁদের মধ্যে কিছু করবার যে বাসনা রয়েছে তাকে আরও উৎসাহিত করলে ভবিষ্যতে এদের কাছ থেকে আরও উন্নতমানের লেখা আমরা পাবো বলে আশা করি।

—:—

হযরত আয়েশা বলেনঃ রসূলে করীম (দঃ) একবার আমার এখানে এসে দেখলেন, এক টুকরা রুটি পড়ে আছে। তিনি তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে নিলেন। অতঃপর বললেনঃ সম্মানীর সম্মান কর। কেননা আল্লাহতা'লা যখন কোন জাতির রিজেক (খাদ্য) কেড়ে নেন, তখন তা আর ফিরে আসে না।

—ইবনে মাজা

কৃষি সংবাদ

পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলমূল নিয়ে গবেষণা ঃ

গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টির অন্যতম ব্যস্ত বিভাগ হলো উদ্যান বিভাগ। বিভাগীয় প্রধান ডাঃ আকবর হোসেনের মতে ১৯৬৫ সালে এই বিভাগ হলেও মূলতঃ ১৯৬৬ সাল থেকেই এর গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। দেশের বিভিন্ন ফল ও শাক-সব্জির ফলন বাড়ানো এবং বিদেশ থেকে আনিত বিভিন্ন ফলের চাষ আমাদের দেশীয় আবহাওয়ায় সম্ভব কিনা এবং এর জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার মূলতঃ এসব বিষয় নিয়েই উদ্যান বিভাগ ব্যাপক গবেষণার কাজ হাতে নিয়েছেন এবং এর অনেকগুলি কাজে বিশেষভাবে সফলতা লাভ করেছে।

আমাদের দেশীয় ফলমূলের মধ্যে কমলা, আম, কলা, আপেল, কপি, টমেটো প্রভৃতি বিভিন্ন ফলমূলের ফসল যতটুকু উন্নততর হওয়া উচিত ছিল তা আজও হয়নি। ফলে ফলমূলের ফলন কমে যাচ্ছে। শীতকালীন ফসলের মধ্যে আলু, কপি, টমেটোর আমদানীও অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান বিভাগ উন্নতমানের ফসল ফলানোর উপর ব্যাপক গবেষণা চালাচ্ছেন। গত চার বছরে ব্যাপক সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। শিক্ষক ছাড়াও এ পর্যন্ত উদ্যান বিভাগ থেকে মোট তিনজন ছাত্র স্নাতকোত্ত শ্রেণীতে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে গেছেন এবং চলতি সালে ৪ জন ছাত্র গবেষণায় রত আছেন।

কপি

শীতকালীন ফসলের মধ্যে ফুলকপি ও বাঁধাকপি প্রদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফসল। প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফুলকপি ও বাঁধাকপি ব্যাপকহারে জন্মালেও এর মান তত উন্নত নয়। সাধারণতঃ আমাদের দেশীয় ফুলকপির ফুল পরিপুষ্ট হবার আগেই ফুল ফুটে যায় এবং এর ফলে বীজ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডক্টর হোসেন বলেন যে, গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার ছোঁয়াচ লাগার ফলেই কপির ফুল ফুটে যায়। গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া থেকে গাছকে রক্ষা করার জন্য কৃত্রিম উপায়ে শৈত্যের প্রায়োগের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন যে, চলতি সালে অগ্রহায়নী, পৌষী ও মাঘি নামক তিনটি জাতের ফুলকপির উপর গবেষণা করে তিনি আশানুরূপ ফল পেয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বীজ সংগ্রহের জন্য যদি কপির চাষ করার প্রয়োজন হয় তবে তা আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে চাষ করা উচিত এবং ডিসেম্বর মাসের পূর্বে সমস্ত প্রকার সার প্রয়োগ করা উচিত। অবশ্য শুধুমাত্র কপির ফুল ফলাবার জন্য শৈত্যের প্রয়োজন হয় না। তবে বীজ সংগ্রহের জন্য শৈত্যের প্রয়োজন যথেষ্ট রয়েছে এবং আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লাগানো ফুলকপি থেকে ভাল বীজ পাওয়া যেতে পারে।

শুধুমাত্র বীজের প্রশ্নই নয় ভাল জাতের কপি কি ভাবে চাষ করা যেতে পারে এ ব্যাপারেও গবেষণা চলছে। তিনি স্নোবল নামক বিদেশী এক জাতের বীজ ও আমাদের দেশীয় ফুল কপির বীজ চাষ করে দেখেন যে, স্নোবল জাতীয় বীজ থেকে ভাল ফুল পাওয়া যায়। এই বীজ সাধারণতঃ ৭০।৮০ দিনে কিংবা ১১০ দিনে ফুল দিয়ে থাকে এবং আমাদের দেশীয় আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, ৭৫ দিনের মধ্যে স্নোবল জাতীয় বীজ থেকে ভাল ফুল ফুটতে পারে। উৎকৃষ্ট স্নোবল বীজ পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়ায় উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কেননা এই বীজ থেকে গাছ হয়ে যখন যথেষ্ট পরিমাণে ফুল দেয় তখন গ্রীষ্ম এসে পড়ে এবং সম

ফুল ঝড়ে পড়ে। বাধ্য হয়েই দেশের বহু মুদ্রার বিনিময়ে সরকারকে প্রতি বছরই বহু টাকার বীজ আনাতে হয়। এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য উদ্যান বিভাগ এক ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তা অনেকটা সাফল্যের পথে। বীজ থেকে চারা গাছ হওয়ার পর কৃত্রিম উপায়ে শৈত্যের প্রয়োগে (৯০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ৩০ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত) ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে ফুল আনার জন্য চেষ্টা চালান হচ্ছে। কেননা সাধারণভাবে গ্লোবর্ল জাতীয় বীজের গাছ মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল দিয়ে থাকে এবং তখন উত্তরী গ্রীষ্মকালীন বাতাসের ফলে ফুল ঝড়ে পড়ে। সুতরাং এ সময়টা কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্ত্তন করে ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে ফলাতে পারলে অনেকটা লাভ-জনক হবে এবং আমাদের দেশের কৃষকরা উন্নতমানের ফুলকপি ফলাতে সক্ষম হবে।

আলুর চাষ

শীতকালীন ফসলের মধ্যে আলু অন্যতম ফসল। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে গোল আলুর চাষ করা হয়ে থাকে। আলুর ভাল ফলন পেতে হলে শুধুমাত্র ভাল বীজেরই প্রয়োজন হয় না। সাথে সাথে সার প্রয়োগের প্রশ্নটাও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার অবকাশ রাখে।

আমাদের দেশে কৃষকরা আলুক্ষেতে শুধুমাত্র গোবরই সার হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। কোন কোন কৃষক আবার ভাল ফললের জন্য নাইট্রোজেন, ফস-ফরাস, পটাশ সার ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তারা সারের পরিমাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে ওয়াকিফহাল না থেকে অনুমানের উপর সার ব্যবহার করেন। এর ফলে ফসলের অনেক সময় ক্ষতি সাধিত হয় এবং ফলন কমে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্যান বিভাগের একজন ছাত্র আলু ফসলে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাসের একর প্রতি পরিমাণের উপর গবেষণা করেন। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে ০, ৬০, ৯০, ১২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন এবং ০, ৬০, ৯০ পাউণ্ড ফসফেট ও পটাশ প্রয়োগ করে পরীক্ষা চালান এবং দেখেন যে আলুর ভাল ফলনের জন্য একর প্রতি ১২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৯০ পাউণ্ড ফসফেট ও ৬০ পাউণ্ড পটাশই উপযুক্ত। তিনি যে গবেষণাকার্য চালান তাতে করে তিনি একরপ্রতি ২৩২ মণ আলু পেয়েছেন।

টম্যাটো

শীতকালের আর একটি ফসল হলো টম্যাটো। টম্যাটোর গাছ বছরের প্রায় সব সময়েই জন্মে থাকে। কিন্তু ৬৫° ফা: ৭০° ফা: এর উপরে তাপমাত্রা হলে এর ফলনে ব্যাঘাত ঘটে, তাই গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে যখন কম তাপমাত্রা থাকে তখন এর ভাল ফলন হয়। টম্যাটোর ফলন বাড়ানো এবং সুস্বাদু করার ব্যাপারেও উদ্যান বিভাগ গবেষণা করেছেন। উন্নতমানের বীজ রোপণেই ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে এই উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি আমেরিকা থেকে আনীত টম্যাটোর পাঁচটি উপজাতের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। এদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান রিভার নামক একটি উপজাত সুফল প্রদান করেছে। গবেষণা করে দেখা গেছে যে, দেশীয় টম্যাটো অপেক্ষা এর ফলন অনেক বেশী, দেখতে আকর্ষণীয় এবং কম টক। এর আকার দেশী টম্যাটোর অপেক্ষা ছোট হলেও এর ফলন অত্যন্ত বেশী এবং ময়মনসিংহ জেলার আবহাওয়া উপযোগী। এ জেলার আবহাওয়ার সাথে অন্যান্য আবহাওয়ার মিল নেই বলে চাষীদের নিকট ইণ্ডিয়ান রিভার জাতের টম্যাটো বীজ বিতরণের পূর্বে প্রদেশের বিভিন্ন সরকারী ফার্মগুলিতে এর চাষ করা হবে এবং যে সমস্ত অঞ্চলে এ জাতের বীজ জন্মাতে পারে সে সমস্ত স্থানের চাষীদের নিকট এ জাতের টম্যাটো বীজ বিতরণ করা হবে বলে ডক্টর আকবর হোসেন উল্লেখ করেন।

বেগুন

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেগুন নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। বেগুনের বিভিন্ন গুণাগুণ বিচার করে কোন জাতের বেগুন সবচেয়ে বেশি ফলন দেয় তার উপরও উদ্যান বিভাগের একজন ছাত্র কাজ করেন। তিনি ছয় জাতের বেগুনের চাষ করেন এবং এর ফলনের উপর দৃষ্টি রাখেন। এ জাতগুলো হল,—ঈশ্বরদী-১

ইসলামপুরী, তালা, খটখটিয়া, সিংনাথ ও 'বল্যাক বিউটি'। বেশী ফলন পাওয়ার ব্যাপারে ছাত্রটি বিভিন্ন জাতের গাছের স্বভাব, গাছের সতেজতা, ফুল দেবার সময় এবং ফল ধরার ক্ষমতার উপর দৃষ্টি রাখেন। তিনি দেখতে পান যে, তালার জাতের বেগুন গাছ থেকে বেশী পরিমাণে এবং সুস্বাদু বেগুন জন্মো থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের উল্লেখযোগ্য জাত হিসেবে তিনি সিংনাথ জাতের কথা উল্লেখ করেন। এ ছয় জাতের বেগুনের মধ্যে ''বলাক বিউটি'' নিকৃষ্টতম বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কলা

অর্থকারী উদ্যানের ফল হিসেবে কলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের অমৃত সাগর কলা অন্যান্য জাতের কলা অপেক্ষা বেশী সুস্বাদু। অথচ মুন্সিগঞ্জের অমৃতসাগর কলার মতো অন্যকোথাও অমৃতসাগরের এত স্বাদ হয় না বলে আমাদের দেশে ধারণা প্রচলিত আছে। অবশ্য স্বাদের প্রশ্নের পূর্বে কেন অমৃতসাগরের ফলন পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে এই পরিপ্রেক্ষিতে উদ্যান বিভাগ গত ১৯৬৬ সাল থেকে গবেষণা করে আসছেন এবং সম্প্রতি আশানুরূপ ফল পেয়েছেন। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিভাগীয় শিক্ষক বলেন যে ঢাকার আবহাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে মার্চ মাসে সর্ব প্রথম এ কলার চাষ করা হয়েছিল। কিন্তু এর ফল আশানুরূপ হয়নি। উদ্যান বিভাগ নিরুৎসাহ না হয়ে পরবর্তী বৎসরের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে অমৃতসাগরের চাষ করেন এবং আশ্চর্য রকমের ভাল ফল পান। বিভাগীয় শিক্ষক আরো বলেন যে প্রতি একরে ৫০০ পাউণ্ড অর্থাৎ সাড়ে ছয় মণ কলার ফলন হয়। তিনি আরো বলেন, পরবর্তী বৎসরের জুলাই মাসে যে সমস্ত কলার ছড়া কাটা হয় (শতকরা ৩ ভাগ) তার ফলও খুবই আশাপ্রদ এবং তিনটি কলার ওজন সর্বোচ্চ এক সের পরিমাণের হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। সার প্রয়োগের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, একর প্রতি ৯০ পাউণ্ড টি, এস, পি, ২৬০ পাউণ্ড মিউরেট অব পটাশ এবং ১৫০ পাউণ্ড ইউরিয়া অমৃতসাগর কলার ভাল ফলনে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কলা গাছের চারা লাগাবার পূর্বে প্রতিটি গর্তে ৪০ পাউণ্ড গোবর দিয়ে চারা লাগানো হয়। এ ফলন ফলাবার জন্য কোনরূপ পানির প্রয়োজন হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অমৃতসাগর কলার স্বাদ কি ভাবে বাড়ানো যায় এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এর স্বাদের তারতম্য ঘটে কেন এ প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর হোসেন জানান যে সার প্রয়োগের ফলেই কলার স্বাদ অনেকটা কমে যায়। কেননা সার প্রয়োগের ফলে গাছের ভিতরে পানির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং স্বাদের তারতম্য ঘটে। এ ছাড়াও প্রতিটি ছড়ায় কলার সংখ্যা যদি বেশী হয় সে ক্ষেত্রেও স্বাদের তারতম্য ঘটে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ ছাড়া কলার ভাল ফলন পেতে হলে গাছগুলিকে মোটামুটিভাবে ঘন করে রোপণ করা উচিত।

ভূমিক্ষয় রোধের লড়াই

সোভিয়েট ইউনিয়নে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধকল্পে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বৎসরে এক বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভূমি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার এলাকার ভূমিকায় ও কৃষি রসায়ন মানচিত্র ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমির পূর্ণ বিবরণ এবং ভূমিক্ষয় রোধ ও জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের মূলসূত্র যুগিয়েছে।

যে সব এলাকা ভূমিক্ষয়ের কবলে পড়েছে, তথাকার ভূমিক্ষয় রোধ সংস্থার উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ভূমিক্ষয় রোধক আঞ্চলিক সংস্থার পরিকল্পনায় ভূমির যথাযথ ব্যবহার, ভূমিক্ষয় রোধক কার্যক্রম গ্রহণ, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং অনাবৃষ্টির মারাত্মক প্রভাব দূরীকরণে দেশের উষর অঞ্চলের সমস্যাবলী সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়।

বিভিন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে ভূমি এলাকার যথা-রক্ষা ব্যবহারের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা গৃহীত হয়েছে (মৃত্তিকাক্ষয়, স্থান বিবরণ, কৃষি-রসায়ন ও ভূমির উন্নতিসাধন ইত্যাদি)।

ক্ষয়প্রাপ্ত ও সামান্য পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত মৃত্তিকা অঞ্চলে বৃহদায়তন ও পর্যায়ক্রমিক শস্য উৎপাদন ক্ষেত্র গঠিত হয়। এ সকল ব্যাপারে যে কার্যক্রম গৃহীত হবে তা হচ্ছে, প্রধানতঃ ভূমিক্ষয়ের হাত থেকে মৃত্তিকা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ আবহাওয়া মণ্ডলীয় পানি ধরে রাখা ও ক্ষেতে পানি আনয়নের জন্য কৃষি কারিগরি ব্যবস্থাদি।

যে সকল ভূমি পতিত জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে ও প্রায়শই ভেজা আবহাওয়ার জলবিন্দুতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং খাড়াই ঢালু জমিসমূহ, এরা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে চাষের অনুপযুক্ত জমির পর্যায়ে পড়ে।

নদীজাল পরিবেষ্টিত এলাকাকে আমরা নিম্নলিখিত পর্যায়ের ভূমির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ শ্রেণীর ভূভাগ হিসাবে পৃথক করার সুপারিশ করি (এ সব জমির অবস্থান ও ব্যবহার মোতাবেক): ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী মারাত্মকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত নদীতীর অহরহ ভেজা আবহাওয়ার জলরেখায় ক্ষয়প্রাপ্ত সংকীর্ণ খাদ্যের তলদেশ ও ভূমি ধ্বংস এলাকা। যে সকল ভূভাগ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাতে কৃত্রিম বন সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়েছে।

স্রোতস্বিনীর অতিশয় স্যাঁতসেঁতে এলাকাসহ ছোট নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখাসমূহ (যেগুলোর পাড় ও তলদেশ থিথিয়ে পড়া জলরেখা ও স্রোতধারায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে) ঘাসের জমির উন্নতি ঘটিয়ে পশুচারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহারের সুপারিশ এবং ভূমিক্ষয় রোধক কার্যাবলী বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে, যাতে অতিশয় স্যাঁতসেঁতে এলাকাগুলোরও উন্নতি সাধিত হবে বলে মনে হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারায় কিছুটা কম মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত খাদের তীর ও তলদেশ নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ ক্ষেত্র হিসাবেও এদের পৃথক পৃথক অংশগুলো ঘাসের জমির মৌলিক ধরনের উন্নতি সাধন করে খড়ের ক্ষেত হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

যে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও যার কর্ষণ কষ্টকর, সে সকল জমির উন্নতি সাধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল ভূখণ্ডকে সুবিধাজনক একটি বৃহৎ ভূখণ্ডকে একত্রীভূত করে। সংকীর্ণ জলধারাসমূহকে এক সমতলে আনয়নের কাজ শুরু করা উচিত। ঢাল বরাবর সরাসরি কর্ষণের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা খাদ অধিকতর সমতল পর্যায়ে আসে। এ ধরনের কর্ষণেও যদি ক্ষুদ্র জলধারা-খাদ এক সমতলের পর্যায়ে না আসে তবে পরবর্তী বৎসরে পুনরায় কর্ষণ করতে হয়। সংকীর্ণ জলধারা-খাদ ও স্রোতস্বিনী এক সমতল বিশিষ্ট উর্বর উপরস্তর ভূ-সমতলে সংরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন।

মৃত্তিকা দ্বারা সমতলীকৃত মাঠের ভূমিক্ষয় রোধকল্পে সমতলে আনীত ক্ষুদ্র জলধারা খাদ ও স্রোতস্বিনীর উপরিভাগের পানি নিষ্কাশনের কারিগরি পদ্ধতিও আরো একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। ঘাসের চামড়া লাগানো ভূখণ্ডসমূহের উপর জল ঢেলে পানি নিষ্কাশন-খাদের দ্বারা এ'কাজ করা হয়।

মাঠের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর জল স্ফীতি অতি সাধারণ হাইড্রোলিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে (পানি সঞ্চয় ও ছোট্ট খাদ দিয়ে পানি নিষ্কাশন বা এ'দুটো একযোগে ব্যবহার করে) এবং কৃত্রিমভাবে বন সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর আরো একটি পদ্ধতি হচ্ছে, পানি নিষ্কাশনের পথ হিসাবে স্রোতস্বিনীর শীর্ষভাগ এক সমতলে আনা ঘাসের চামড়া লাগানো ও ঘাস জন্মাতে দেওয়া হয়। ভালভাবে ঘাস না জন্মানো অবধি উপরিভাগের বাড়তি পানি স্রোতস্বিনীর সুপরিকল্পিতভাবে তৈরী শীর্ষদেশ থেকে ভূমিক্ষয় ঘটে না এমন স্থান দিয়ে প্রবাহিত করা হয়।

নিয়ম হিসাবে স্রোতস্বিনীর উভয় পার্শ্ব ও খাড়া ঢালসমূহ পশু চারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

২০ থেকে ২২ সিন্টিমিটার গভীরতা কর্ষণই অধিকতর ফলপ্রদ হয়েছে। ফালির মধ্যবর্তী জমিতে লাঙ্গল দেয়া হয় এবং ইতিপূর্ব্বে কর্ষিত ফালিতে ঘাস জোরদার হয়ে উঠলেই পুনরায় ঘাস লাগানো হয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালেই (অধিকতর আর্দ্র সময়ে) ঘাস রোপণ হয়। ঘাস রোপণের পূর্বে মাটিতে খনিজ (নাইট্রোজেন ও ফসফরাস) ও অন্যান্য জৈবিক সার প্রয়োগ করা হয়।

উক্ত এলাকার অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ঘাসের সাথে এ ঘাসের মিশ্রণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ক্ষয়প্রাপ্ত সারবিহীন জমিতে চাষে আশাপ্রদ ফললাভ ঘটে না। ঘাস আবাদের ব্যাপারে সার প্রয়োগ করে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে।

এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে স্রোতস্বিনীর উভয় তীর সংলগ্ন এলাকা খাড়া ঢাল ও মারাত্মকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত এলাকাসমূহকে মৃত্তিকা সংরক্ষণ পর্যায়ে এবং এমনকি কখনো কখনো পর্যায়ক্রমিক শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আখের মূল্য বৃদ্ধি

ঢাকা, ৪ঠা জুলাই। পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রদেশের চিনি কলসমূহ কর্তৃক উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে আখ ক্রয়ের মূল্য পূনঃনির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই মূল্য অনুসারে মিলগেটে প্রতিমণ আখ ৩ টাকা এবং আউট ষ্টেশনের ক্রয় কেন্দ্রে ২.৭৫ টাকা দরে ক্রয় করিতে হইবে।

অদ্য এক সরকারী প্রেসনোটে প্রকাশিত উক্ত খবরে বলা হয় যে, কৃষকের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং তাহাদের আখের আরও বেশী মূল্য দানের উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত মে মাসের পূর্ব্বে আউট ষ্টেশন ক্রয় কেন্দ্র ও মিলগেটে উক্ত মূল্য ছিল যথাক্রমে ২ টাকা ২৫ পয়সা ও ২ টাকা ৫০ পয়সা। এই বৎসর মে মাসে উহাকে ২ টাকা ৫০ পয়সা ও ২ টাকা ৭৫ পয়সায় বর্দ্ধিত করা হয়।

পৃথিবীর সম্পদ

পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই বহুদেশ মারাত্মকভাবে খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়েছে। জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, মানবজাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক হয় অনাহারে নতুবা অপুষ্টিতে কাটাচ্ছে। তথাপি কিছু খাদ্য চাহিদা পূরণকল্পে মানবজাতি এখনও পর্যাপ্ত উৎপাদনক্ষম সকল জমি আবাদ করতে পারেনি। যেমন দক্ষিণাঞ্চলে জঙ্গলাবৃত বনভূমি, উত্তরাঞ্চলের তুন্দ্রা, পাহাড়-পর্বতের ঢালু গাত্র, জলাভূমি এবং সর্ব্বোপরি তৃষার্ত্ত মরু অঞ্চল ও স্তূপভূমি—ভবিষ্যতে এ সকল এলাকা প্রয়োজনীয় কৃষি ফসলের বাড়তি উৎপাদন উৎসে রূপান্তরিত হতে পারে।

পূর্ব্বে চাষাবাদকৃত অথচ পরে যে সকল জমি ফেলে রাখা হয়েছিল—সে সকল অনাবাদী ও দীর্ঘ দিনের পতিত জমির উন্নতি সাধনের কাজ সোভিয়েত ইউনিয়নে মাত্র ১৫ বৎসর পূর্ব্বে শুরু হয়েছে। নতুন নতুন জমির বিশাল এলাকা সাফল্যজনকভাবে ব্যবহারোপ-যোগী করে তোলার ক্ষেত্রে এটি একটি নজির হিসাবে গণ্য হতে পারে। এরূপে কাজাখস্তান ও সাইবেরিয়ার অতি অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান ফসল গম আবাদের উপযোগী করে তোলা হয়েছে।

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনাবাদী ও দীর্ঘদিনের পতিত জমির উন্নতি সাধনের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অনুমোদিত হয়। সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আহবানে শত-সহস্র উৎসাহী ব্যক্তি বিশেষ করে যুবকের দল প্রাচ্য এলাকায় গমন করে। এই কার্যক্রম সম্পাদনে তরুণ "তসেলিন নিকসরা" (অনাবাদী জমি আবাদকারী) এত বিপুল উৎসাহে সাড়া দেয় যে, এর মাধ্যমেই দেশ এ কার্য শুরু করে এবং দেশের খাদ্য সম্পদ বৃদ্ধির সংগ্রামে যুবসমাজের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। স্তেপ-ভূমির সম্পদ আহরণে বিজয়ী ও প্রথম আবিষ্কারে রোমান্টিকতায় এরা ছিল আপ্লুত। কার্যক্ষেত্রে

আগমনপূর্বক এ সকল যুবকের দল সত্যিকার মালিকের ন্যায় নিজেদেরকে উপরোক্ত পরিস্থিতিতে সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে সক্রিয় হয়ে ওঠে—যুব দলের প্রাণবন্ততায় উষর বিগত যৌবনা স্তেপভূমি যেন পুনর্যৌবন লাভ করে এবং যুবকদলের আবেষ্টন আবেগে নিজের রুক্ষ মূর্তিকে সে সহজতর কর তোলে। রাষ্ট্র নতুন নতুন জমির সুপরিকল্পিত উন্নতিবিধানে নির্দেশ প্রদান পূর্বক অবিলম্বে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উদ্যোগী হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যে অধিক উন্নত রাষ্ট্রীয় খামার সোভখজেস-এর সাংগঠনিক ও অপরাপর অভিজ্ঞতা পূর্ব স্তেপভূমিকে বশে আনার কাজে বাধ সাধে—আবাদকারীদের প্রতি নির্মম, কঠোর হয়ে ওঠে, কিন্তু রাষ্ট্রের নিকট থেকে প্রাপ্ত সাহায্য, সমর্থন ও সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত হয়ে শক্তিশালী কর্মমুখর মানুষের প্রচেষ্টার মুখে স্তেপের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে, স্তেপভূমি মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার কাছে নতি স্বীকার করে বশীভূত হয়, নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়।

হাজার হাজার নির্মাতা স্তেপভূমিতে নতুন নতুন প্রশস্ত সড়ক ও রেলপথে নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়, নতুন নতুন রাষ্ট্রীয় খামার বসতি এলাকা, এমনকি নগরী নির্মাণের কাজও শুরু করে। যে উন্মুক্ত প্রস্তরে শত শত বৎসরেও কোন পথের পত্তন হয়নি, সে সকল স্থান দিয়ে ট্রাক ড্রাইভারগণ ইতি মধ্যেই নতুন নতুন রাষ্ট্রীয় খামারে শস্যবীজ ও মেশিনপত্রের যোগান দিতে শুরু করে এবং ট্রাক্টর ড্রাইভারগণ প্রথম মৃত্তিকাবক্ষে লাঙ্গলের ফলায় খাত কাটতে শুরু করে ও ট্রাক্টরসহ বীজবপন যন্ত্রকে কর্ষিত জমিতে নিয়ে আসে। প্রতিটি রাষ্ট্রীয় খামার আবাদের জন্য হাজার হাজার হেক্টর জমি লাভ করে। ফলে এসব খামার খাদ্যশস্য উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়।

তসেলিননিকসরা তাদের প্রথম পর্যায়ের তাঁবুর আস্তানা থেকে আরামদায়ক বাসগৃহসমূহে উঠে আসে, বিয়ে করে ও গৃহ-সংসার পেতে বসে।

যুদ্ধের কঠিনতম বৎসরগুলো পাড়ি দিয়ে আসার পরও ব্যাপকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন দেশে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের উৎস বৃদ্ধির যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, দেশ এভাবেই তার মোকাবেলা করে।

প্রথম বৎসরেই তসেলিননিকসরা ১ কোটি ৭০ লক্ষ হেক্টর জমিতে শস্য আবাদ করে। মূল পরিকল্পনার নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষাও এ ছিল অধিক। আর তা ছিল স্তেপভূমির তরুণ বিজেতাদের শ্রম উদ্দীপনারই ফলশ্রুতি-স্বরূপ। পরবর্তী বৎসরে উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ—নতুন আবাদী জমির সাথে দেশের শস্য উৎপাদনকারী পুরাতন এলাকা—উত্তর ককেশাস ইউক্রেন; ভলগা এলাকাসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়া শস্য ভাণ্ডারের জমির পরিমাণ ৩ কোটি হেক্টরে উন্নীত হয়। এ সকল অঞ্চল প্রতি বৎসর রাষ্ট্রকে বিপুল পরিমাণ গম-ফসল সরবরাহ করে থাকে। এমন কি, গত বৎসর আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কাজাখ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় শস্যাগারে ১ কোটি ১০ লক্ষ টনেরও অধিক খাদ্যশস্য সরবরাহ করে। এই ছিল ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদিত মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণের এক ষষ্ঠাংশ।

ব্যাপকভাবে যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে, যেমন, যান্ত্রিক উপায়ে জমিতে চাষ দেওয়া, বীজ বপন ও শস্য কর্ত্তন ইত্যাদি সকল কাজই পুরাপুরিভাবে মেশিনের সাহায্যে সম্পাদিত হয় বলে এ সকল পোড়ো এলাকা থেকে অতি অল্প ব্যয়ে ও বিপুল পরিমাণে শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়। পোড়ো জমির রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের লাভালাভের বিষয়টি নিম্নের উদাহরণ থেকে সহজেই বোঝা যাবে। কস্তানাই এলাকার অক্তিয়াবর জেলায় ১৪টি সুবিশাল শস্য উৎপাদন সোভ খজস সংগঠনে রাষ্ট্রে ৩০ কোটি রুবল ব্যয় হয়। প্রথম ৪ বৎসরকাল রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে রাষ্ট্র ১২০ কোটি রুবল লাভ করে।

নতুন নতুন জমি আবাদযোগ্য করে তোলার প্রথম প্রচেষ্টা শুরুর সময় থেকে এ পর্যন্ত ১৫ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে এবং এর মধ্যে তসিলনিনক্সরাপ আরো বহু কিছু শিখেছে, তাদের অভিজ্ঞতা বেড়েছে। যেমন,—

তারা এ অভিজ্ঞতা আহরণ করেছে যে, পোড়ো জমি থেকে প্রথম চোটেই "দুধ মাখনটুকু" চুষে নেয়া বড় কথা নয়—বড় কথা হলো, অর্জিত সাফল্যকে যথাযথ-ভাবে টিকিয়ে রাখা। কৃষকগণ এতদাঞ্চলে প্রকৃতির ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর কায়দা কৌশল ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করেছে বটে, তথাপি এখনো পর্যন্ত স্তেপ অঞ্চলের পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়া ফসলের ফলনে প্রতি বৎসরই নানা অসুবিধা ঘটিয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া সাপেক্ষে সোভিয়েট বিজ্ঞানি-গণ পোড়ো জমির প্রতিটি আবাদী এলাকার জন্যই এক বিশেষ কৃষি কারিগরি ব্যবস্থা উদ্‌ভাবন করেছেন এদের মধ্যে রয়েছে উপরিস্থিত ভূমির বায়ুতাড়িত ক্ষয়রোধের জন্য ভূমিস্তর না উলটানো, জলীয় বাষ্পা-ধার ও ফসল রক্ষার কাজে সহায়ক কৃত্রিম বনভূমি সৃষ্টি, সকল পর্যায়ের কাজ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাধান, খনিজ সার প্রয়োগ ও জমিতে পর্যায়ক্রমে সঠিক ফসল বপন ইত্যাদি ব্যবস্থা। কৃষি উৎপাদন তীব্রতর করার ফলে পোড়ো জমির অশেষ উৎস থেকে আরো অধিক-তর ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়ে উঠবে।

—::—

সকল অনাবাদী জমি আবাদ করুন

শাক-সব্জী, ফল-মূল ও রবিশস্যের

উৎপাদন বাড়ান

দুধ-মাছ মাংস-ডিমের উৎপাদন ও

সরবরাহ বাড়ান

গবাদি পশু, হাঁস-মুরগীর যত্ন নিন ও

রোগ প্রতিরোধ করুন

খাদ্যের প্রাচুর্যে দেশকে ভরে তুলুন

আমাদের কথা

প্রেসিডেন্টের উৎপাদন বৃদ্ধির আহবান

গত ৩রা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাঁচ দিন ব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য দেশে উৎপাদনের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রমের আহবান জানান।

বাজারে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ না থাকলে, জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পায় এবং জনসাধারণের নানা দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, দ্রব্যমূল্য স্থায়ীভাবে স্থিতিশীল ও অনুকূল রাখার ব্যাপারে এটাই হচ্ছে সাধারণ বাস্তব নীতি। আজ যে ভাবে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, বাজারে পণ্য সরবরাহের ঘাটতিই যে এই অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী, তা আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারছি। বিশেষ করে উপর্যুপরি বন্যার ফলে আউস ও আমন ফসলের বিরাট ক্ষতি হওয়ায়, বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতির স্থায়ী প্রতিকারের জন্য চাহিদা অনুযায়ী আমাদের যথাসাধ্য উৎপাদন বৃদ্ধির বাস্তব ও ফলপ্রসূ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মাটির উৎপাদন ক্ষমতাকে পুরাপুরি কাজে লাগিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে অগ্রসর হচ্ছেন। এখানে ১৯৬৯-৭০ সালের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কর্মসূচীতে ১ কোটি ২৩ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয়েছে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য সময়োপযোগী ব্যবস্থাদি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ যেমন বীজ, সার, দমকল, ঋণ, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক বলেন যে, এই কর্মসূচী শুধু পৃথকভাবে কৃষি বিভাগেরই নয়, ইহা নিশ্চিতভাবেই সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। এই কমসূচী কার্যকরী করার জন্য সমস্ত বিভাগ ও সংস্থাগুলিরই সক্রিয় সহযোগিতার দরকার। সর্বশেষে তিনি এই মর্মে আশা প্রকাশ করেছেন যে, যেহেতু অধিক সংখ্যক দেশবাসীই কৃষিজীবী, তাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচীকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে; এই কর্মসূচীতে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে, আমরা নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবো এবং তাতে দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

—০—